দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

সুশাসন, নিরাপত্তা ও জনকল্যাণ
নতুন পশ্চিমবঙ্গ নির্মাণের অভিযাত্রা
— পৃঃ ১১

রাজ্যের হৃতগৌরব ফিরিয়ে আনতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাথমিক উদ্যোগ প্রশংসনীয়— পৃঃ ১৫

৭৮ বর্ষ, ৪১ সংখ্যা।। ৮ জুন, ২০২৬।। ২৪ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩৩।। যুগাব্দ - ৫১২৮।। website : www.eswastika.com

অন্নপূর্ণা যোজনা
মাসে ৩০০০ টাকা প্রত্যেক সুবিধাপ্রাপক মহিলাকে

নিঃশুল্ক বাস ভ্রমণ
সরকারি বাসে মহিলাদের সম্পূর্ণ বিনামূল্যে যাতায়াত

সপ্তম পে-কমিশন
রাজ্য সরকারি কর্মীদের ক্ষেত্রে শীঘ্রই বাস্তবায়ন

স্বামী বিবেকানন্দ স্কলারশিপ
রাজ্যের মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বার্ষিক অনুদান

উপাসনা পদ্ধতির ভিত্তিতে সবরকম অনুদান বন্ধ

রাজ্যে আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প চালু করার সিদ্ধান্ত

সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়ার জন্য বিএসএফকে প্রয়োজনীয় জমি হস্তান্তর

সরকারি চাকরির আবেদনের ক্ষেত্রে বয়সের ঊর্ধ্বসীমা বৃদ্ধি

অনুপ্রবেশকারীদের জন্য ‘ডিটেক্ট-ডিলিট-ডিপোর্ট’ প্রক্রিয়া

রাজ্যে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা ও জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০ বলবৎ

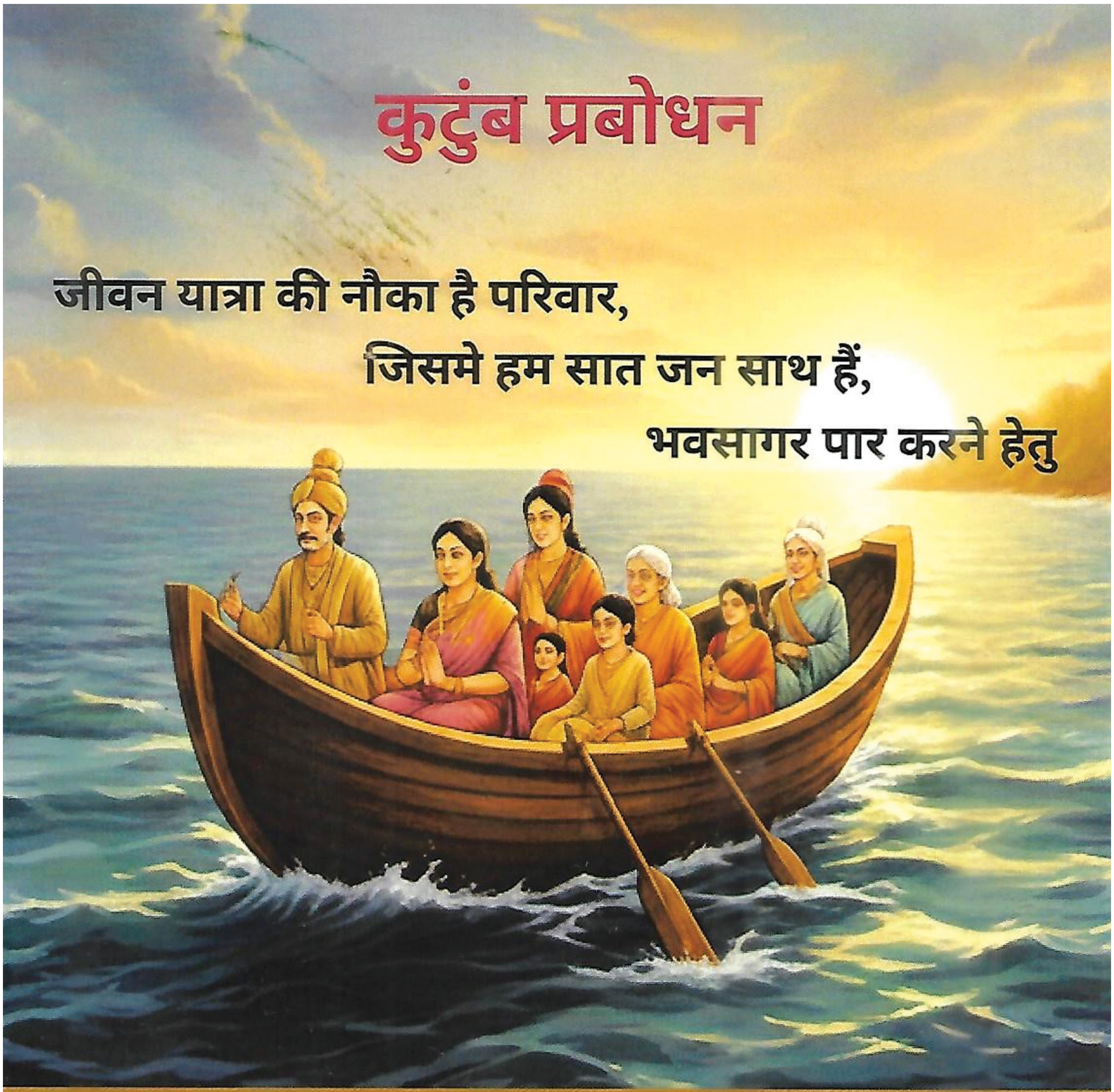

लक्ष्य

संयुक्त परिवार	संगठित, सशक्त, सुरक्षित परिवार
स्वस्थ परिवार	समर्थ, संपन्न, समृद्ध परिवार
सुसंस्कृत परिवार	समर्थ, संपन्न, समृद्ध परिवार
आदर्श परिवार	समर्थ, संपन्न, समृद्ध परिवार

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৮ বর্ষ ৪১ সংখ্যা, ২৪ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

৮ জুন - ২০২৬, যুগাব্দ - ৫১২৮

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশচন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ভাবনা ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2025-2027

R N I Regd. No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন-এর পক্ষে প্রকাশক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত। মুদ্রক প্রশান্ত কুমার হাজরা।

ফঃ ১

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ◻ ৫

সতর্ক থাকতে হবে জনশক্তির প্রকাশকে ‘বেনোজল’ যেন ভিজিয়ে না দেয় : ‘বহিবারে দাও শকতি’ ◻ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ◻ ৬

হাট্টিমাটিম ডিম ◻ সুন্দর মৌলিক ◻ ৭

শয়তানেরা ঘুমায় না, শয়তানির মূল্য মৃত্যু ◻ শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী ◻ ৮

সুশাসন, নিরাপত্তা ও জনকল্যাণ নতুন পশ্চিমবঙ্গ নির্মাণের অভিযাত্রা ◻ সাধন কুমার পাল ◻ ১১

মোগল শাসন আর তৃণমূল শাসনের পতনের কারণ একই ◻ সুজিত রায় ◻ ১৩

রাজ্যের হৃতগৌরব ফিরিয়ে আনতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাথমিক উদ্যোগ প্রশংসনীয় ◻ আনন্দ মোহন দাস ◻ ১৫

রোহিঙ্গা নয়, বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী নয়, প্রকৃত ভারতবাসীই শুধু আমার ভাই ◻ অভিজিৎ দাশগুপ্ত ◻ ১৭

ভারতের ক্রমবর্ধমান রপ্তানি নীতি এবং মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির গুরুত্ব ◻ পূর্ব রায়চৌধুরী ◻ ১৮

নিষ্কাম কর্ম, ভক্তি, জ্ঞান ও কৃপা এক সাধনপথের সমগ্র রূপ ◻ অনামিক রায় ◻ ৩১

বিজ্ঞান সাধনায় প্রাচীন ভারতবর্ষ ◻ অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায় ◻ ৩৪

শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারের কাছে রাজ্যবাসীর চাহিদা ◻ গৌতম কুমার মণ্ডল ◻ ৩৫

কবি নজরুলের কালীভক্তি, শ্যামাসঙ্গীত ও বিদ্রোহী চেতনার অন্তর্লোক ◻ সৌম্যব্রত দাসগুপ্ত ◻ ৩৭

২০২৬-এর পরিবেশ বার্তা : পরিবেশ রক্ষার দ্রুত পদক্ষেপ ◻ সঞ্জিত কুমার সাহা ◻ ৩৯

পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পুনর্জাগরণ— হিন্দুত্ব, জাতীয়তাবোধ ও ২০২৬-এর নতুন দিগন্ত ◻ ড. প্রসেনজিৎ মুখোপাধ্যায় ◻ ৪৩

‘বন্দে মাতরম্’ : শ্রীঅরবিন্দের জাতীয়তাবাদী নির্দেশ ◻ সৈকত নিয়োগী ◻ ৪৬

সেকুলারিজম : ইতিহাস ও ভারতীয় সভ্যতার সংঘাত ◻ উত্তম মণ্ডল ◻ ৪৮

দেড় দশকের ‘তৃণমূলি ত্রাস’ জনতার ‘তাৎক্ষণিক বিচার’! ◻ বিপ্লব বিকাশ ◻ ৪৯

গল্প কথায় ডাক্তারজী ◻ সংকলক—বিমলকৃষ্ণ দাস ◻ ৫০

নিয়মিত বিভাগ :

◻ **চিঠিপত্র : ১৯-২০** ◻ **অঙ্গনা : ২১** ◻ **সুস্বাস্থ্য : ২২** ◻ **সমাবেশ সমাচার : ২৩-৩০** ◻ **নবাঙ্কুর : ৪০-৪১**

প্রকাশিত হবে
১৫ জুন
২০২৬

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
১৫ জুন
২০২৬

পশ্চিমবঙ্গ দিবস

২০ জুন দিনটি পশ্চিমবঙ্গবাসীর কাছে একটি আবেগের দিন। ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ভারত বিভাজনের সময় পাকিস্তানের কবল থেকে অর্ধেক বঙ্গ ছিনিয়ে নিয়ে বাঙ্গালি হিন্দুর অস্তিত্ব রক্ষার ভূমি হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের সৃষ্টি করেছিলেন। সুখের বিষয়, ভারতীয় জনতা পার্টি এই দিনটিকেই 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে পালন করে থাকে।

স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় এই বিষয়ে আলোকপাত করবেন কয়েকজন রাজনৈতিক বিশ্লেষক।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION

A/C. No. : **103502000100693**

IFSC Code : **IOBA0001035**

Bank Name :

INDIAN OVERSEAS BANK

Branch : **Sreemani Market**

Kolkata-700 006

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার বার্ষিক গ্রাহকদের প্রতি সপ্তাহে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পত্রিকা পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০্ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ২১০০্ টাকা (মোট ২৮০০) টাকা পাঠাতে হবে।

যে সকল গ্রাহক প্রতি মাসের পত্রিকা (৪/৫টি) একত্রে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে নিতে ইচ্ছুক তাদের গ্রাহক মূল্য ৭০০্ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ৫৫০্ টাকা (মোট ১২৫০ টাকা) পাঠাতে হবে।

যোগাযোগ : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫   ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেক Subhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**

Bank A/c --- 103502000100693   IFSC -- IOBA0001035

Bank -- Indian Overseas Bank

Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

এই ‘যোগক্ষেম’ রক্ষা করিতেই হইবে

২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টি বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করিয়া পশ্চিমবঙ্গে সরকার গঠন করিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ এই জয়লাভকে এবং নূতন সরকার গঠনকে সুশাসনের সূত্রপাত বলিয়া মনে করিতেছেন। স্বাধীনতার পর হইতে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ মারামারি, হানাহানি ও রক্তপাত দেখিয়া বড়োই ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ইহার সূত্রপাত সেই কংগ্রেসি আমলে। নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপি ও বিরোধীদের ভোটদানে বাধা প্রদান এবং উগ্র ছাত্র-যুব রাজনীতি পশ্চিমবঙ্গে দুর্বৃত্তায়নের সূচনা করিয়াছিল। ইহার উপর ১৯৭৫ সালে সারা দেশের ন্যায় পশ্চিমবঙ্গেও জরুরি অবস্থার নামে তাহারা মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করিয়াছিল। সেই সময় তাহারা অসংখ্য বিরোধী রাজনৈতিক কর্মী ও নেতাকে বিনাবিচারে কারাগারে বন্দি রাখিয়াছিল। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ন্যায় দেশভক্ত সংগঠনকেও নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হইয়াছিল। পুলিশের পাশাপাশি দলীয় ক্যাডারদের আস্ফালন রাজ্যে এক ভীতির পরিবেশ নির্মাণ করিয়াছিল। কংগ্রেসের পর দীর্ঘ চৌত্রিশ বৎসর বামেদের লাল সন্ত্রাসে পশ্চিমবঙ্গের মাটি রক্তরঞ্জিত হইয়াছিল। ইহাদের লাল সন্ত্রাসের তালিকা বড়ো দীর্ঘ। পাকাপাকিভাবে ক্ষমতা দখল করিবার পূর্বেই ১৯৭০ সালে তাহারা সাঁইবাড়ি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করিয়া বিরোধী নিকাশের খেলা শুরু করিয়াছিল। সাঁই পরিবারের উপর বর্বরোচিত আক্রমণ করিয়া, পরিবারের সদস্যদের হত্যা করিয়া, পুত্রের রক্তে রঞ্জিত অন্ন মাতাকে খাইতে বাধ্য করিয়াছিল। ১৯৭৯ সালে সুন্দরবনের মরিচঝাঁপি দ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করা উদ্বাস্তু শরণার্থীদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করিয়া নির্বিচারে হত্যা করিয়াছিল। ১৯৮২ সালে কলকাতার বিজন সেতুতে ১৭ জন আনন্দমার্গী সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীকে জীবন্ত দগ্ধ করিয়াছিল। ইহা ব্যতীত বিরোধী মতাদর্শের ব্যক্তিবর্গকে সামাজিক বয়কট, এলাকা ছাড়া করা, সরকারি সহায়তা প্রকল্পের সুবিধা হইতে বঞ্চিত করা ইত্যাদি নানা অত্যাচারে রাজ্যের মানুষকে জর্জরিত করিয়াছিল। ইহার জন্য তাহারা এক সন্ত্রাসী বাহিনী তৈরি করিয়াছিল। মানুষ ইহাদের ‘হার্মাদ’ আখ্যা দিয়াছিল। এই সুদীর্ঘ রাজনৈতিক হিংসা, হত্যা ও সন্ত্রাসে জর্জরিত হইয়া রাজ্যবাসী তাহাদের পরিবর্তনের পথ প্রশস্ত করিয়াছিল। লাল সন্ত্রাসকে বিদায় জানাইয়া রাজ্যবাসী যাহাদের ক্ষমতায় আনিয়াছিল, ক্ষমতাসীন হইয়াই তাহারা উন্নততর সন্ত্রাসী হইয়া উঠিয়াছিল। পনেরো বৎসরের শাসনে ইহারা প্রতিপক্ষ দলের বহু নেতা-কর্মীকে হত্যা করিয়াছে। বামেদের ন্যায় ইহারাও বিরোধী খতমের রাজনীতিতে মাতিয়া উঠিয়াছিল। তাহার উপর ইহাদের নেতা-মন্ত্রী-কর্মী সকলেই সীমাহীন দুর্নীতিতে নিমজ্জিত হইয়াছিল। তাহার খতিয়ানও বড়োই দীর্ঘ। বলা হইয়া থাকে, এই দলটির সৃষ্টি হইয়াছিল শুধুমাত্র রাজ্যটিকে লুণ্ঠন করিবার জন্যই। সর্বাপেক্ষা উদ্বেগের বিষয় হইয়াছিল ইহারা বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গা মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের অবৈধ নথিপত্র প্রস্তুত-পূর্বক তাহাদের ভোটাধিকারের অধিকার প্রদান করিয়াছিল। স্বয়ং দলনেত্রী ইহাদের হিন্দুদিগের উপর আক্রমণে প্ররোচনা দিয়াছিলেন। ফলস্বরূপ, মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায় হিন্দুদিগের জীবন বিপদের মুখে পড়িয়াছিল। মনে হইতেছিল, পশ্চিমবঙ্গ যেন ইসলামি শাসনে রূপান্তরিত হইয়াছে। এই ভয়াবহ পরিস্থিতি হইতে মুক্তি পাইতে হিন্দু সমাজ এই প্রথম সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া ভোটাধিকার প্রয়োগ করিয়া সেই অপশাসনের অবসান ঘটাইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুদিগের নিকট ইহা যেন দ্বিতীয় স্বাধীনতা লাভ।

অনেক সাধ্য সাধনা, অনেক পরিশ্রমের বিনিময়ে হিন্দু সমাজ এই পরিবর্তন আনয়ন করিয়াছে। নবগঠিত রাজ্য সরকার সুশাসনের সূত্রপাতও করিয়াছে। ইতিমধ্যে সরকার সুশাসন, স্বচ্ছতা এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছে। রাজ্যের সহিত সমগ্র দেশের সুরক্ষার স্বার্থে সীমান্তের বাকি অংশে কাঁটাতারের বেড়ার জন্য জমি অধিগ্রহণের কাজও সমাপ্ত করিয়াছে। স্বাভাবিকভাবেই রাজ্যবাসীর বিশ্বাস দৃঢ় হইয়াছে যে এই নূতন রাজ্য সরকার রাজ্যের হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার করিতে সক্ষম হইবে। কিন্তু রাজ্যবাসীকেও স্মরণে রাখিতে হইবে, সুদীর্ঘ অপশাসনের পর রাজ্যের পালাবদল তথা এক রাষ্ট্রভক্ত সরকারের ক্ষমতা গ্রহণ, ইহা ঈশ্বরের আশীর্বাদেই সম্ভব হইয়াছে। স্বয়ং ঈশ্বরই পশ্চিমবঙ্গবাসীকে এই ‘যোগক্ষেম’ প্রদান করিয়াছেন। ইহাকে রক্ষা করিবার দায়িত্ব শুধুমাত্র রাজ্য সরকারের নহে, রাজ্যবাসীরও। ক্ষুদ্র স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠিয়া এই সুশাসনকে স্থায়ী করিবার জন্য নূতন সরকারকে সর্বপ্রকারে সহযোগিতা করিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে, দেশ-বিদেশের ভারত বিরোধী শক্তিগুলি সক্রিয় রহিয়াছে। তাই হিন্দু সমাজকে সদা সতর্ক থাকিতে হইবে।

সুভাষিতম্

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনা পর্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্।। (শ্রীগীতা- ৯।২২)

অর্থ ঃ অনন্যচিত্তে যে ভক্তগণ আমাকে সর্বদা নিষ্কামভাবে ভজনা করেন, সেই নিত্য সমাহিত ভক্তগণের অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি এবং প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষা আমিই করে থাকি।

সতর্ক থাকতে হবে জনশক্তির প্রকাশকে ‘বেনোজল’ ভিজিয়ে না দেয়

‘বহিবারে দাও শকতি’

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গের সংহিতা আর স্মৃতিশাস্ত্র ভারতীয় সংবিধান। প্রকৃতপক্ষে হিন্দুত্ব হলো তার আত্মাস্বরূপ । তার পরিপন্থী সবকিছুই অস্বীকারযোগ্য। কোনোপ্রকার জেহাদি আর দেশ বিরোধী বিভাজনকে স্বীকার করা যাবে না। পশ্চিমবঙ্গকে একটি জীবন্ত রাজ্যে রূপান্তর করাই মূল লক্ষ্য। সে বক্তৃতার ভাষা যেন সমকালীন প্রজন্মের বোধগম্য হয়। রাজ্যের নতুন সরকারকে তা লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রতিটি শব্দচয়নে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। কুসংস্কার, অপসংস্কৃতি আর কুরুচিকর মন্তব্যকে সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করে যা কিছু ভারতীয় আর দেশীয় আদর্শের পরিপন্থী তাকে নির্মূল করতে হবে। কোনোরকমের আপোশ রফা চলবে না। এটাই রাজ্যের মানবাত্মার বিধান।

দীর্ঘ সাত দশকের অভিশাপ থেকে পশ্চিমবঙ্গ মুক্ত হয়েছে । নতুন পরিবেশ তৈরি হয়েছে। আগে শুনতে হতো বিজেপির ক্যাডার বা কর্মী নেই। এখন তারা বলছে বিজেপির বিপুল ভোটার আছে । এর থেকে আর বড়ো আশীর্বাদ কী হতে পারে? যে দলের পাশে ভোটার আর মানুষ রয়েছে তার চেয়ে বেশি লাভ কী? তবে ভোটারদের সে আশা বিজেপিকেই পূর্ণ করতে হবে। ২০২১-এর বিধানসভা ভোটের পর বিজেপির পশ্চিমবঙ্গ জয় কেবল সময়ের অপেক্ষা ছিল। বাজারি পত্রিকাগুলির সে ভাবনার উর্বরতা আর উদারতা আগেই উবে গিয়েছিল। তার জন্য পূর্ববর্তী সরকার একটি সারমেয় গোষ্ঠী তৈরি করেছিল। তারা মহাশূন্যে মিলিয়ে গিয়েছে। কিছু দুরাত্মা আর কপট ভুল স্বীকার করে পুনরায় জালিয়াতির খেলায় নেমেছে। পূর্ববর্তী সরকারের বাজনদারদের প্রত্যাখ্যান করে পশ্চিমবঙ্গকে নতুন ভাবনায় জারিত হতে হবে।

২০২১ আর ২০২৪-এর ভোটে এরাজ্যে বিজেপি প্রায় ৪০ শতাংশের কাছে ভোট পেয়েছিল। বোঝা গিয়েছিল তাদের লম্বা দৌড়ের গতি। তাদের কাছে পশ্চিমবঙ্গ জয় ছিল সময়ের অপেক্ষা। একসময়ের ভোটকুশলী ২০২১-এর রাজ্য বিধানসভা ভোটের পর বলেছিলেন— ‘বিজেপি এ রাজ্যে থাকতে এসেছে। চলে যেতে নয়।’ পশ্চিমবঙ্গই একমাত্র রাজ্য যেখানে বিজেপি প্রধান ‘বিরোধী দল’ হয়ে ওঠার পাঁচ বছরের মাথায় ক্ষমতায় এসেছে। রাজ্যের পূর্ববর্তী শাসক একধরনের অসামাজিক আর পারিবারিক গোষ্ঠী হিসাবে রাজ্য চালাত। রাজনৈতিক দল হয়ে নয়। ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর যে পরিমাণ বিক্ষোভ আর দুর্নীতি প্রকাশ্যে আসছে তাতে তাদের ‘গ্যাং’ বলাই ভালো। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে যে নতুন সরকার গঠন হয়েছে তারা ইতিমধ্যেই সংখ্যাগুরু হিন্দু আর এখানকার মানুষ আর ভোটারদের ভাবনার সঙ্গে সঙ্গত মিলিয়ে বেশ কয়েকটি ইতিবাচক পদক্ষেপ নিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বুঝিয়েছেন যে, সকলের জন্য এক আইন। তাই মানুষের কাছে পৌঁছে যাওয়ার একটা স্বাভাবিক প্রয়াস তাদের রয়েছে। ফলে প্রথমেই অন্যায় আর অনধিকারের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। সীমান্তে বেড়া দেওয়া আর বেআইনি অনুপ্রবেশ বন্ধের চেষ্টা যেমন চলছে, পাশাপাশি রয়েছে অন্নপূর্ণা যোজনার মতো প্রতিশ্রুতি পূরণের প্রস্তুতি পর্ব। তবে এই সরকার মুড়ি আর মুড়কিকে এক করে দেখছে না। তার জন্য যোগ্য-অযোগ্যের চুলচেরা বিচার চলছে।

বিগত সাত দশকে রাজ্যের জনবিন্যাস সম্পূর্ণ পাল্টে গিয়েছে। বাংলাদেশে মোল্লাবাদী জামাতের উত্থান এই রাজ্যকে এক সাংঘাতিক বিস্ফোরক বিন্দুর উপর দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। দ্যোতক হিসাবে তাদের হয়ে কাজ করছে এই রাজ্যের দুটি রাজনৈতিক দল আর সমাজমাধ্যমে সক্রিয় কয়েকটি দেশ-বিরোধী গোষ্ঠী। এদের ভাবনা আর বক্তৃতার ভিতর দিয়েই মোল্লাবাদীরা এরাজ্যে দেশ-বিরোধিতার জায়গা করে নিয়েছে।

মন্ত্রীসভার সম্প্রসারণকে পুরোমাত্রায় নজরে রেখেও দু'সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে মানুষ আর ভোটারকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পালন করছে রাজ্যের নবনির্বাচিত সরকার। বিহারেও সরকার গঠন করতে ২২ দিনের বেশি সময় লেগেছিল। ইতিমধ্যেই পূর্ববর্তী সরকার আর দলের প্রধান দু'টি মুখের ভিতর একজন সরাসরি জনরোষের মুখে পড়েছেন। গত ৪ মে প্রকাশিত পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল অনুযায়ী পূর্ববর্তী শাসক দল ৪০ শতাংশের বেশি ভোট পেয়েছে। তাই প্রশ্ন উঠছে কারা এই ভোট দিল? কেন? পনেরো বছরের অন্যায় অবিচার আর তস্করগ্রাসে থাকা রাজ্যে কাদের সহানুভূতি পেল পূর্ববর্তী শাসক দল। ভোটারের আশীর্বাদে যে পাঁচ শতাংশ বেশি ভোট আর ১৩১টি (প্রায় ৬১ শতাংশ) বেশি আসন পেয়ে বিজেপি ক্ষমতায় এসেছে মানুষের সে আশা বিজেপিকেই পূর্ণ করতে হবে। তার জন্য সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে।

(লেখকের মতামত ব্যক্তিগত)

হাড্ডিমাটিম ডিম

ডিম-পিসিমু দিদি,

আপনি কি এক ঢিলে দুই পাখি মারতে গিয়েছিলেন। পরাজিত ও বিপর্যস্ত তৃণমূলের প্রতি জনমানসের প্রতিক্রিয়া কতটা মারাত্মক সেটা বুঝতেই কি ভাইপোকে সোনারপুরে পাঠিয়েছিলেন! এ সব কথা দুর্জনেরা নয়, আপনার ভাইয়েরাই বলছেন গো দিদি।

মানুষের নাড়ি বোঝার দক্ষতা যে আপনার আর নেই সেটা দিদি ভোটের ফলেই বোঝা গেছে। কিছুই বুঝতে পারেননি যে এত বড়ো সর্বনাশ হতে চলেছে। আবার অভিষেককে সোনারপুরে পাঠিয়ে সেই নাড়িই বোঝার চেষ্টা করেছিলেন নাকি সিঁটিয়ে ঘরে ঢুকে যাওয়া নেতা-কর্মীদের পথে ফেরানোর চেষ্টা।

ভোটে ধরাশায়ী হওয়ার পরে অভিষেক তো অন্তরালেই ছিলেন। এমনকী তাঁর ডায়মন্ড হারবার লোকসভার অন্তর্গত ফলতার পুনর্নির্বাচনেও তিনি দলীয় প্রার্থীর পাশে গিয়ে দাঁড়াননি। ভোটের ফল বেরোনোর ২৬ দিন পরে ভাইপোটাকে পাঠানোর সময়ে একবারও কি ভাবেননি কী কী হতে পারে!

সোনারপুরে অভিষেককে ঘিরে গত ৩০ মে যেভাবে ক্ষোভের 'ডিম-ঝড়' দেখা গিয়েছে, তাকে 'বিজেপির হামলা' বলছে তৃণমূল। কিন্তু ঘটনাপরম্পরা এবং স্থানীয় সূত্র থেকে মেলা তথ্য সেটা বলছে না। কাগজে যা পড়লাম, টিভিতে যা দেখলাম তাতে তো তৃণমূলের উপর স্থানীয় মানুষের রোষই ছিল ঘটনার মূল কারণ। ওই এলাকারই এক গৃহবধূকে টিভিতে বলতে দেখলাম, "এই পাড়ায় বিজেপির কোনো সংগঠনই তৃণমূল কোনোদিন তৈরি হতে দেয়নি। সিপিএমের যদিও বা কিছুটা সংগঠন ছিল, বিজেপির কিছুই ছিল না। সাধারণ লোক নিজের ইচ্ছায় গিয়ে বিজেপি-কে ভোট দিয়ে দিয়েছে। কিন্তু পাড়ায় মার্কামারা বিজেপির লোক বলতে কেউই নেই।" তিনি এটাও বলছিলেন, পুরোটাই তৃণমূলের দুর্নীতি ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ।

সোনারপুরে অভিষেক যেতে পারেন, এই খবরে জনতার মধ্যে ক্ষোভ বাড়তে শুরু করেছিল বলে স্থানীয় তৃণমূল সূত্রও জানাচ্ছে। তাই অভিষেক এলাকার তৃণমূল নেতা-কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে ঘটনাস্থলে যেতে চাইলেও তাঁদের প্রায় কেউই অভিষেকের সঙ্গী হতে চাননি। এমনকী যে ওয়ার্ডে অভিষেক গিয়েছিলেন, সেই ওয়ার্ডের 'প্রধান' তৃণমূল নেতাও কাউন্সিলর স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন বলে শুনলাম।

দলের যে মৃত কর্মীর পরিবারের সঙ্গে গত ৩০ মে অভিষেক দেখা করতে গিয়েছিলেন, সেই সঞ্জু কর্মকারের বাড়ি রাজপুর- সোনারপুর পুরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডে। সেই ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর অনিতা বসুর স্বামী তথা দলের স্থানীয় নেতা হেমন্ত বসুকে ভাইপোর দপ্তর থেকে তো ফোন করা হয়েছিল। কিন্তু তখন এলাকার পরিস্থিতি অভিষেকের সফরের অনুকূল নয় বলে তিনি জানিয়েছিলেন। অভিষেকের সঙ্গী হওয়ার বিষয়ে নিজের অপারগতার কথাও তিনি জানিয়েছিলেন। কিন্তু ক্যামাক স্ট্রিটের দপ্তর থেকে পালটা বলা হয়, প্রত্যেকেই পালিয়ে যেতে চাইলে চলবে না, সঙ্গে থাকতে হবে। পরিস্থিতি ভালো নয় বলেই অভিষেকের এই সফর বাতিল করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল বলে হেমন্ত ফের জানান। ঘনিষ্ঠদের কাছে তিনি দাবি করেছেন, কথোপকথন সেখানেই শেষ হয়ে যায়। তবে অনিতা বা হেমন্ত, কেউই অভিষেকের সঙ্গে সেদিন ছিলেন না। অভিষেকের সফরের পরিকল্পনা বহাল থাকছে বলে জানতে পেরে সেদিন সকালে অনিতা-হেমন্ত বাড়ি ছেড়ে চলে যান বলেও স্থানীয় সূত্রে খবর। এসব তো আপনি জানেন দিদি!

শুধু ওঁরা নন, রাজপুর-সোনারপুরের পুরপ্রধান বা অন্যান্য পরিচিত তৃণমূল নেতা— কেউই অভিষেকের সঙ্গে গত ৩০ মে ছিলেন না। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার তৃণমূল বিধায়ক বা সাংসদদের কাউকে তাঁর সঙ্গী হতে দেখা যায়নি। সোনারপুরের দুই প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ককেও দেখা যায়নি।

এদিকে দিদি, হামলার ঘটনায় যাঁরা গ্রেপ্তার হয়েছেন, তাঁরা তো সোনারপুর দক্ষিণের প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক লাভলি মৈত্রের ঘনিষ্ঠ ছিলেন বলেই জানা গিয়েছে। তাঁকে তো ভাইপো টিকিটই দিতে চায়নি। কম রাগ নাকি দিদি! ভাইপোর সফর অথচ লাভলিও ছিল না কেন! দিকে দিকে সবাই আপনাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে। আপনি রাজনীতি না ছাড়লেও রাজনীতি আপনাকে ছেড়ে দিতে চাইছে। তাই সাবধান থাকুন দিদি। আর পারলে ভাইপো বাছাটাকে একটু আঁচলের তলাতেই রাখুন। যা দুষ্টুমি করেছে তাতে এখন আর বাড়ির বাইরে না যাওয়াই ভালো। কোথা থেকে কখন ডিম উড়ে আসে সেটা কি আর বলা যায় দিদি! □

আপনি রাজনীতি না ছাড়লেও রাজনীতি আপনাকে ছেড়ে দিতে চাইছে। তাই সাবধান থাকুন দিদি। আর পারলে ভাইপো বাছাটাকে একটু আঁচলের তলাতেই রাখুন। যা দুষ্টুমি করেছে তাতে এখন আর বাড়ির বাইরে না যাওয়াই ভালো।

শয়তানেরা ঘুমায় না, শয়তানির মূল্য মৃত্যু

শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী

ছোটবেলায় একটা বই পড়েছিলাম। বইটার নাম 'শয়তানেরা ঘুমায় না'। আজ তা চাক্ষুষ করছি। স্বাধীনতার পর প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ থেকে শুরু করে সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় পর্যন্ত কংগ্রেসি সরকারগুলির ভুলভ্রান্তির সূক্ষ্ম ছিদ্র দিয়ে বামপন্থী নামক যে কালসর্প পশ্চিমবঙ্গের বাসরঘরে প্রবেশ করেছিল তা পরবর্তীতে বঙ্গবাসীর মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ১৯৭০ সালে বর্ধমানের সাঁইবাড়িতে ছেলের মাথা কেটে তার রক্তমাখা ভাত মাকে জোর করে খাইয়ে বামপন্থীরা 'জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব'-এর যে সূচনা করেছিল, পরে ১৯৭৭ সালে ক্ষমতায় আসার পর তা পরিবর্তিত হয়েছিল 'সর্বহারার মহান বিপ্লবে'। তারই প্রতিফলন আমরা প্রত্যক্ষ করেছিলাম মরিচঝাঁপি উদ্বাস্তু গণহত্যা, বিজন সেতুর সন্ন্যাসী হত্যা, নানুর, ছোট আঙ্গারিয়া, নন্দীগ্রাম, নেতাই-সহ শতশত ঘটনার মধ্যে দিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে বানতলা, ধানতলা, অনিতা দেওয়ান প্রভৃতি ছোট ঘটনাগুলোতো আছেই।

তারপর ১৯৭৭ থেকে ২০১১, দীর্ঘ ৩৪ বছরের সিপিএমের শাসন — শুধু বিপ্লব আর বিপ্লব। লাল ঝান্ডায় মোড়া পশ্চিমবঙ্গে বন্ধ, ধর্মঘট, জঙ্গি আন্দোলন আর পিকেটিং। এসবের জ্বালায় যেদিন বঙ্গলক্ষ্মীর ঘট উল্টালো, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-সংস্কৃতি, ধন-মান সব হারিয়ে প্রকৃতপক্ষে সর্বহারা হলো, তখন বাঙ্গালি বুঝল বামপন্থীদের সঙ্গে পথ চলতে চলতে তারা পৌঁছে গেছে ধ্বংসের দোরগোড়ায়। অতলে তলিয়ে যাওয়া শুধু সময়ের অপেক্ষা।

ঠিক এমনই সময় 'বাংলা বাঁচানো'র স্বপ্ন দেখিয়ে কোথা থেকে উদয় হলেন এক স্বপ্নের জাদুকরি। ৩৪ বছরের অভুক্ত বাঙ্গালিকে সে মাতৃবেশে স্তন্যপান করাতে এগিয়ে এল। সরলমতি বাঙ্গালিও তাকে বিশ্বাস করে তার হাতে নিজেকে সঁপে দিল। তার সর্বস্ব দিয়ে বসিয়ে দিল সিংহাসনে। কিন্তু হায়! বাঙ্গালি এবারও শত্রু চিনতে ভুল করল। দ্বাপর যুগে পুতনা যেমন কংসের নির্দেশে শিশু কৃষ্ণকে হত্যা করতে বিষ মাখা স্তন্যপান করাতে উদ্যত হয়েছিল, ঠিক তেমনি সেও তার নিয়োগকর্তা জেহাদি সন্ত্রাসীদের অঙ্গুলিহেলনে বাঙ্গালি হিন্দুকে তার জন্মভূমি থেকে সমূলে বিনাশ করে চুপিসারে পশ্চিমবঙ্গকে ইসলামি শাসনের অধীনে নিয়ে যাবার কাজ করে যেতে থাকল। বিগত ১৫ বছর ধরে শুধু তোষণ তোষণ আর তোষণ। বাঙ্গালি হিন্দুর জমিজমা, টাকাকড়ি, চাকরি-বাকরি, অর্থ-সম্পদ, ধর্ম-দেবালয়, এমনকী ঘরের মা-বোনেদের সম্ভ্রম, সবকিছুর দখল তুলে দিল তাদের প্রভু 'দুধেল গাই' জেহাদিদের হাতে। প্রকৃতপক্ষে বঙ্গে মুঘলযুগ ফিরে এল। অবশেষে হিন্দুরা যখন বুঝতে পারল বাম ও তৃণূ শাসনে ৫০ বছরে তাদের সবকিছু বিধর্মীর কবলে, তখন তারা একজোট হয়ে খড়কুটোর মতো আঁকড়ে ধরল বিজেপিকে। বিজেপি পৌঁছে গেল ৩ থেকে ৭৭, ৭৭ থেকে ২০৮-এ --- দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায়। প্রায় ৮৫০ বছর পর বঙ্গে হিন্দুরাজ প্রতিষ্ঠা হলো।

কিন্তু শয়তানেরা ঘুমায় না,তারা সুযোগের অপেক্ষায় ঘাপটি মেরে থাকে। আবার শুরু হলো শয়তানের খেলা। রাজ্যে যেই ক্ষমতার পালাবদল হলো, তৃণমূল গোহারা হারলো, অমনি তাদের বাঁচাতে আসরে নামল সিপিএম। বিগত ১৫ বছরে তৃণমূলের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সবচেয়ে যারা উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করত, রাস্তার তিনমাথার মোড়ে লাল ঝান্ডা ঝুলিয়ে, চারগাছা লোক নিয়ে তৃণমূলের জোচ্চুরির কথা বলে গলার শিরা ছিঁড়ে ফেলতো, তারা আজ মমতা ব্যানার্জির চোর-ডাকাতদের বাঁচাতে আইনি সহায়তা দিতে এগিয়ে এল। টকশোতে কীর্তন গেয়ে বিখ্যাত হওয়া তৃণমূলনেত্রী অদিতি মুন্সি ও তার স্বামী দেবরাজ চক্রবর্তীর আয়বহির্ভূত বিপুল সম্পত্তির কথা প্রকাশ্যে আসতেই তাদের বাঁচাতে আদালতে দাঁড়িয়ে পড়লেন কমরেড বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য। যারা দু'বেলা নিয়ম করে মিডিয়ায় তৃণমূলের দুর্নীতির বিরুদ্ধে হাত-পা ছুঁড়তেন, তারা আজ তৃণমূলের চোরেদের বাঁচাতে কলকাতা হাইকোর্টে। কেন ? তিনি নাকি সিপিএমের নেতা হিসেবে নয়, আইনজীবী হিসেবে কর্তব্যবোধের টানে তাদের পাশে দাঁড়াচ্ছেন। বলছেন, 'কেউ আইনি সাহায্য নিতে এলে সে সিপিএম করে না বলে তাকে কি আমি তাড়িয়ে দিতে পারি? যদি মমতা ব্যানার্জিও বিপদে পড়ে আমার কাছে আইনি সাহায্য চান আমি তার পাশেও দাঁড়াতে প্রস্তুত।' বাঃ, বিকাশবাবু বাঃ! বলিহারি আপনার কর্তব্যবোধ। আপনি কমরেডই বটে! তবে আমি ছোট মাথার মানুষ। এত পড়াশোনা করিনি। বলছিলাম কী, চোরেদের বাঁচাতে আপনার কর্তব্যবোধ আছে, যাদের সর্বস্ব চুরি গেল তাদের বাঁচাবার কর্তব্য নেই ? আইনজীবীদের পেশা ডাক্তার-নার্সদের মতো নাকি? দেবরাজ- অদিতিদের প্রাণ বাঁচানো ডাক্তার-নার্সদের নৈতিক কর্তব্য হতে পারে, কিন্তু চোরেদের চুরির মামলা থেকে বাঁচানো কি কোনো আইনজীবীর নৈতিক কর্তব্য হতে পারে?

তিনি যদি শুধু আইনজীবী হতেন তবে এই কথা উঠত না। কিন্তু তিনি রাজনীতিবিদ। দুর্নীতি, সিন্ডিকেট-রাজ, তোলাবাজির বিরুদ্ধে কথা বলেন। দু'দিন আগেই যাদবপুরে ভোটে দাঁড়িয়ে দুর্নীতিবাজদের ধরে ধরে শাস্তি দেবেন বলেছিলেন। আর আজ পেশার নাম করে সিন্ডিকেটের অন্যতম মাস্টারমাইন্ড দেবরাজকে আদালতে ডিফেন্ড করছেন। তিনি গৃহস্থের উকিল, আবার চোরেদের উকিল। বিকাশবাবু, আপনারা কি জনগণকে এতটা বোকা ভাবেন? ভাবছেন, এভাবেই জনগণতান্ত্রিকবিপ্লব দীর্ঘজীবী হবে? হবে না। একদমই হবে না।

এই নির্বাচনে সিপিএম সর্বশক্তি নিয়ে নেমেছিল যাতে তৃণমূল আবার পাঁচ বছরের জন্য ক্ষমতায় ফিরে আসার ছাড়পত্র পায়। চেষ্টায় তারা কোনো খামতি রাখেনি। কমরেড শতরূপ বলেছিলেন, 'বিজেপি কোনোমতেই ক্ষমতায় আসবে না।' আচ্ছা, সিপিএম তো শূন্য ছিল। তবে কার ক্ষমতায় আসার কথা বলেছিলেন শতরূপবাবুরা ? আরও বলেছিলেন

“৪ মে-র পরে শুভেন্দু অধিকারী ক’কেজি হিন্দু থাকে দেখে নেবে।” হিন্দুদের উদ্দেশ্যে কী তুচ্ছ তাচ্ছিল্য শব্দবন্ধ? হিন্দু হওয়ার মাপকাঠি ‘কেজি’ ? শেষপর্যন্ত হিন্দুদের অপমান করার ফল হাতেনাতে পেয়েছে তারা। তৃণমূলও হেরেছে, নিজেরাও গোহারা হেরেছে।

কিন্তু যে কথা বলেছিলাম— শয়তানেরা ঘুমায় না, তারা সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। যেই শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে সরকার গঠিত হলো, জনকল্যাণকারী সিদ্ধান্ত নেওয়া শুরু হলো, অমনি সিপিএম বিরোধিতায় নেমে পড়ল। সকলেই জানে, কলকাতা আজ অবৈধ বাংলাদেশিদের স্বর্গরাজ্য। হাকিম সাহেব তো তাকে ‘মিনি পাকিস্তান’ বলে ঘোষণা করেই দিয়েছিলেন। নতুন সরকার সেই অবৈধ অনুপ্রবেশকারী-পূর্ণ বস্তিতে বেআইনি বাড়ি ভাঙতে বুলডোজার পাঠতেই পথে নেমে পড়লেন শতরূপবাবুরা। বললেন, ‘এদের বাড়ি ভাঙতে দেব না, এদের তাড়াতে দেবো না। প্রয়োজনে শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত লড়াই করব।’ এরা কাদের বাঁচাতে পথে নেমেছেন? বিদেশি ও আইনভঙ্গকারীদের বাঁচাতে। যে অনুপ্রবেশকারীরা তিলোত্তমা কলকাতাকে পূতিগন্ধময় করে তুলেছে, সেই অবৈধ দখলদারদের বাঁচাতে।

অন্যদিকে, শিয়ালদহ পার্কসার্কাস-সহ বহু জায়গায় রেলের জমিতে অবৈধভাবে গজিয়ে ওঠা বস্তি দখলমুক্ত করতে উচ্ছেদ অভিযান চলছে। বহুবছর ধরেই এগুলি অবৈধ বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গা মুসলমানদের স্বর্গরাজ্য। এখানেও এই অভিযানের বিরুদ্ধে পথে নেমেছে বিধানসভা নির্বাচনে পরপর দু’বার জামানত খোয়ানো নেত্রী মীনাক্ষী দিদিভাই। বলেছেন, ‘রেল কারও বাপের সম্পত্তি নয়। রেলের নিজস্ব জমি আছে নাকি ? ওটা তো আমাদের টাকায় চলছে।’ ঠিক বলেছেন ম্যাডাম। একশো পার্সেন্ট সঠিক কথা। রেলের সম্পত্তি মানে জাতীয় সম্পত্তি। আর সেটা আমাদের সম্পদ। কেবল আপনার নয়, আমাদের সকলের। তাই আমাদের সম্পত্তিতে কাকে থাকতে দেবো সেটা আপনি ঠিক করবেন কেন? আমরা পশ্চিমবঙ্গবাসী সকলে মিলে ঠিক করব। আপনার বাপের সম্পত্তি হলে আপনি সেখানে এই অবৈধ লোকেদেরকে বসাতে পারেন। কিন্তু এ সম্পত্তি আপনার বাপ দাদা চোদ্দপুরুষের নয়। তাই এ নিয়ে আপনার কথা বলার কোনো অধিকার নেই। শতরূপ আবার বলেছে ‘গুজরাটের বরোদরায় স্টেশনে মোদী চা বিক্রি করতে পারলে শিয়ালদা স্টেশনে হকাররা কেন চা-ঝালমুড়ি বিক্রি করতে পারবে না ?’ ওরা মিথ্যাচার করে মানুষকে ভুল বোঝাচ্ছেন। আসলে কোনও বৈধ দোকান ভাঙ্গা হচ্ছে না। কেবলমাত্র দখলীকৃত, অবৈধ দোকান ভাঙ্গা পড়ছে। তাও আগে থাকতে নোটিশ দিয়ে। আচ্ছা শতরূপবাবু, ‘অপারেশন সানশাইন’ এর নাম শুনেছেন? আপনাদের গর্বের ৩৪বছরেই হয়েছিল ? তখন যেসব দোকান, ঘর আপনারা ভেঙেছিলেন তারা কি মঙ্গলগ্রহ থেকে এসেছিল? কোনও সভ্য দেশে এই অবৈধভাবে দখল করে দোকান - ব্যবসা চলা উচিত? যাত্রীসাধারণের সুগম যাতায়াত, যাত্রী নিরাপত্তা এসব সরকার ভাববে না ? অবশ্য এসব আপনাদের বিকৃত মস্তিষ্কে ঢুকবে না। তাছাড়া যারা শূন্য থেকে মহাশূন্যের দিকে যাত্রা করছেন, তাদের ভোটব্যাংক জোটানোর জন্যে নোংরামি করতেই হবে! অর্ধ শিক্ষিতরা মানবাধিকারের দোহাই দিয়ে অবৈধ বাংলাদেশিদের হয়ে পথে নেমেছে। বলি, শিশুবয়সে বর্ণপরিচয়ের দ্বিতীয় ভাগটা পড়েছিলেন? সেই নীতি গল্পটা? যেখানে আছে ‘পরের দ্রব্য না বলিয়া লইলে চুরি করা হয়?’ যারা বছরের পর বছর সরকারি সম্পত্তিকে অবৈধভাবে নিজের বানিয়ে রেখেছে, তাদের সিপিএমের ভাষায় সাধু বলতে হবে? কেউ যদি রোজ চুরি করে সংসার চালায় তাহলে কি সেই চুরিটাকে মানবিক দৃষ্টিতে দেখে পুলিশ গ্রেপ্তার করতে পারবে না? নাকি যতদিন কোনো বিকল্প ব্যবস্থা না হচ্ছে ততদিন তাকে চুরি করতে দেওয়া উচিত? শতরূপ-মীনাক্ষীদের যদি এতই মায়া, তবে দিন না আপনাদের নেতা-নেত্রীদের নিজেদের জমিতে, ফ্ল্যাটে একটু ব্যবস্থা করে। নিজের বাড়ির কিছুটা অংশ ছেড়ে দিয়ে সেই বিদেশিদের ঠাঁই করে দিন। অথবা আপনাদের আলিমুদ্দিনকে হকার মার্কেট বানিয়ে পুনর্বাসন দিন। সরকারি সম্পত্তি নিয়ে ফোঁপর দালালি কেন?

একসময় সিপিএমের ক্ষমতায় থাকার মূল কারিগর ছিল এই মুসলমান ভোট। পরে এরাই আবার হয়ে উঠেছিল তৃণমূলের ভোটব্যাংক। এরা জোট বেঁধে ভোট দেয়। হিন্দুরা সংগঠিত নয়। কিন্তু ইতিহাসে এই প্রথমবার হিন্দুরা এক হয়ে বিজেপির পক্ষে দাঁড়িয়েছে। তৃণমূল হেরে ভূত হয়েছে।

আসলে এই বিকাশবাবু-শতরূপ-মীনাক্ষীরা এত লম্পঝম্প করছে একটি মাত্র কারণে। সেটি হচ্ছে মুসলমান ভোট। যার মধ্যে একটি বড় অংশ এখানে লুকিয়ে থাকা অবৈধ অনুপ্রবেশকারী। যাদের সিপিএম-তৃণমূল সমস্ত রকমের পরিচয়পত্র তৈরি করে দিয়ে অবৈধভাবে পাড়ায়-মহল্লায়-বস্তিতে বসিয়ে দিয়েছে। একসময় সিপিএমের ক্ষমতায় জেতার মূল কারিগর ছিল এরা। পরে এরাই আবার হয়ে উঠেছিল তৃণমূলের ভোটব্যাংক। এরা জোট বেঁধে ভোট দেয়। হিন্দুরা সংগঠিত নয়। কিন্তু ইতিহাসে এই প্রথমবার হিন্দুরা এক হয়ে বিজেপির পক্ষে দাঁড়িয়েছে। তৃণমূল হেরে ভূত হয়ে গেছে। তাই সিপিএম আজ তাদের সেই পুরনো মুসলমান ভোটব্যাংক ফিরিয়ে এনে নতুন করে পশ্চিমবঙ্গ দখলের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে।

ফলতার নির্বাচনী ফলাফল দেখে সিপিএম মহানন্দে ধেই ধেই করে নেত্য করতে শুরু করেছে। দিকে দিকে কচি মাকু-মাকুনিরা বলতে শুরু করেছে তারা দ্বিতীয়, বিরোধী শক্তি। তারাই আগামীর মুক্তিসূর্য। টিএমসি তো চতুর্থ স্থানে, মায়ের ভোগে । যেখানে যত দু’নম্বরি আর অনুপ্রবেশকারী, ততই

লালঝান্ডার লাভ। ভাবখানা এমন, যেন ২০২৭ সালে অষ্টম বামফ্রন্ট সরকার তৈরি হলো বলে! ওরে নারে না। ওই ১৯.৩৪ পার্সেন্ট তোমাদের ভোট নয়, 'ISF'-এর। অবস্থা বুঝে দুধেলরা গোয়াল পরিবর্তন করেছে মাত্র। মুসলমান ভোট 'ISF'-এ কনভার্ট হচ্ছে। যেহেতু সিপিএম-আইএসএফ জোট তাই ১৯ শতাংশ। ওটা মোটেই তোদের ভোট নয়। তোমরা যেই ৪.৭১ শতাংশ ছিলে, তাই আছ। হিসেবপাতি না করে ছাগলের তৃতীয় বাচ্চার মতো নাচানাচি করলে হবে?

অনেকে বলছেন, ফলতার ফল পশ্চিমবঙ্গের জন্য এক অশনি সংকেত। দেশদ্রোহী বামপন্থীদের এই উত্থান পশ্চিমবঙ্গের জন্য ভয়ংকর। বিষয়টা যে একেবারে উড়িয়ে দেওয়ার তা নয়। তবে আমার মনে হয় বামপন্থীদের কিছুটা ভোট বাড়লেও বিশেষ চিন্তা করার কারণ নেই। শুধু শুভেন্দুবাবুদের একটু সতর্ক হয়ে চলতে হবে। যেখানে যেখানে যাদবপুর বা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো বাম- অতিবামপন্থীদের অভয়ারণ্য আছে সেখানে একটু কড়া ডোজের অ্যাসিড স্প্রে করে দিতে হবে। দেখবেন, ঘুণপোকাগুলো কিলবিল করে মারা পড়বে। না বাঁচবে বাঁশ, না বাজবে বাঁশরি। এরা যেখান থেকে জন্মেছে সেটা অপারেশন করে কেটে দিলেই ল্যাটা চুকে যায়। তখনই 'ভারত তেরে টুকরে হোঙ্গে' বলা, 'আজাদি' চাওয়া, 'অপারেশন সিন্দুর' অভিযানের বিরোধিতা করা, 'কীসের ভারত' জানতে চাওয়া ঈপ্সিতা-দীপ্সিতা-মীনাক্ষী-শতরূপ-সৃজন- কলতানদের প্রোডাকশন চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে। এজন্য স্কুলে- কলেজে দেশভক্তির চর্চা শুরু হোক। এখানে মার্ক্স-লেনিন -স্তালিন-মাও সে তুং-এর চর্চা বন্ধ করে বঙ্গের প্রণম্য মনীষী শ্রীচৈতন্য-শ্রীরামকৃষ্ণ- বিবেকানন্দ, বঙ্কিম- রবীন্দ্র-নজরুলদের চর্চা শুরু হোক। বিদ্যার্থী পরিষদ, অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘ প্রভৃতি রাষ্ট্রভক্ত সংগঠনগুলির অবাধ প্রবেশ হোক। এত বছর ধরে এই সব স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে চাক বেঁধে বসে থাকা মার্ক্স লেনিনের নাতি-নাতনি আরবান মাওবাদীরা ঘাপটি মেরে বসে থাকতো, প্রফেসর সেজে, বুদ্ধিজীবী সেজে লুকিয়ে থাকতো, বলতো 'তুম কিতনে আফজল মারোগে, ঘর ঘর সে আফজল নিকলেগা', ভোটের সময় 'নো ভোট টু বিজেপি' লেখা লাল শালু নিয়ে পথে বেরিয়ে পড়তো। এরা ভেবেছিল এই শিক্ষাঙ্গনগুলি তাদের চোদ্দপুরুষের সম্পত্তি।

পুলিশ-প্রশাসন- আদালত-সরকার কেউ তাদের ছুঁতে পারবে না। এটা তাদের অভয়ারণ্য। হিসাবে বড়ো ভুল করে ফেলেছো হে। দিন পাল্টেছে। এখন আর জ্যোতি-বুদ্ধ-মমতা ক্ষমতায় নেই। ক্ষমতা রাষ্ট্রভক্তদের হাতে। বেশি ট্যাঁ ফোঁ করলে প্রয়োজনে আধাসেনা দিয়েও তোমাদের উপযুক্ত পরিষেবা দিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

যে কথা দিয়ে শুরু করেছিলাম, শয়তানেরা ঘুমায় না। এ সত্যি, কিন্তু তার চেয়েও বড়ো সত্যি হলো তাদের অন্তিম পরিণতি হলো মৃত্যু। পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরা জেগেছে। এখানে হয় ভালোভাবে থাকো, নয় অন্তিম গন্তব্যের জন্য প্রস্তুত হও। সেখানে চিরশান্তিতে তোমরা বিরাজ করবে।

আগামীদিনে এই দেশদ্রোহী কমিউনিস্টদের পশ্চিমবঙ্গে কোনো স্থান নেই।

পরলোকে ড. নির্মলেন্দুবিকাশ রক্ষিত

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ লেখক গবেষক জাতীয়তার পূজারি ড. নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত গত ২৬ মে-র সকালে পরলোকগমন করেন। অমায়িক, মৃদুভাষী সরল জীবনযাপনে অভ্যস্ত এক মানুষ। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর। তিনি রেখে গেছেন স্ত্রী, এক পুত্র, পুত্রবধূ, নাতি-নাতনি-সহ বহু গুণমুগ্ধ ব্যক্তি। তাঁর মরদেহে মাল্যার্পণ করে শ্রদ্ধা জানায় স্বস্তিকা ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্থানীয় শাখার স্বয়ংসেবকরা।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি নিউ আলিপুর কলেজে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। তিনি একই সঙ্গে রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি (জেএনইউ) ও ইতিহাস (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) বিষয়েও স্নাতকোত্তর ছিলেন। অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা ছিল তাঁর জীবনচর্যার অঙ্গ। সেই সঙ্গে লেখালিখি। তিনি দীর্ঘদিন ধরে সাপ্তাহিক স্বস্তিকা-সহ যুগান্তর, বর্তমান, স্টেটসম্যান (ইংরেজি ও বাংলা) পত্রিকায় নিয়মিতভাবে লিখেছেন। ভারত ও পশ্চিমবঙ্গের সমসাময়িক ঘটনাই ছিল তাঁর লেখার বিষয়। জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই তিনি বিভিন্ন বিষয়ের বিশ্লেষণ করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর ওপর লেখা তাঁর কয়েকটি বই রয়েছে।

স্বস্তিকা পত্রিকায় তাঁর লেখালিখি শুরু সেই নব্বইয়ের দশকের প্রথম থেকে। শুধু লেখক নন, তিনি স্বস্তিকা পরিবারের ছিলেন একজন আত্মীয়। তাঁর পারিবারিক অনুষ্ঠানেও স্বস্তিকার সকলের আমন্ত্রণ থাকত। বাঘাযতীন এলাকায় তাঁর বর্তমান বাসভবন হলেও তাঁর পৈতৃক ভিটা পূর্ববঙ্গের নোয়াখালি জেলায়। ২৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯ সালে কলকাতায় ভবানীপুরে তাঁর জন্ম। সাউথ সুবার্বন স্কুলের ছাত্র ছিলেন। স্বস্তিকার ষাটবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে কলকাতায় মহাজাতি সদনে তাঁর হাতে 'স্বস্তিকা সম্মান' তুলে দেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের তৎকালীন সরসঙ্ঘচালক কে এস সুদর্শন।

লেখালিখির পাশাপাশি তিনি ছবি আঁকতেও ভালোবাসতেন। বৈষ্ণব পদাবলীকে কেন্দ্র করে আঁকা তাঁর ছবিগুলি ছিল নজর কাড়ার মতো। তাঁর প্রয়াণে ভারতমাতা এক সুসন্তানকে হারালো।

সুশাসন, নিরাপত্তা ও জনকল্যাণ

নতুন পশ্চিমবঙ্গ নির্মাণের অভিযাত্রা

সুশাসন কোনো একদিনের বিষয় নয়— এটি একটি অবিরাম সাধনা। সরকার, প্রশাসন ও সমাজ; সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টাতেই সুশাসনের ভিত্তি সুদৃঢ় হবে।

সাধন কুমার পাল

সুশাসন কেবল সরকার পরিবর্তনের নাম নয়; সুশাসন হলো শাসনের চরিত্রের পরিবর্তন। সুশাসন মানে আইনের শাসন, স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা, দুর্নীতির বিরুদ্ধে আপোশহীন অবস্থান, সীমান্তের নিরাপত্তা এবং সাধারণ মানুষের কল্যাণকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া। পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে মানুষ এমন একটি প্রশাসনের প্রত্যাশা করছিল, যেখানে দল নয়, আইন চলবে; তোষণ নয়, ন্যায় হবে; দুর্নীতি নয়, সততা হবে প্রশাসনের ভিত্তি।

নতুন সরকার সেই প্রত্যাশা পূরণের লক্ষ্যে প্রথমদিন থেকেই একাধিক সাহসী ও যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন, নিয়োগে স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা, বেআইনি নির্মাণ ও জমি দখলের বিরুদ্ধে বুলডোজার অভিযান, সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের জন্য দ্রুত জমি হস্তান্তর, অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধে কঠোর ব্যবস্থা, প্রশাসনিক কাজে মিতব্যয়িতা এবং আইনশৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্যোগ; সব মিলিয়ে পশ্চিমবঙ্গে সুশাসনের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে।

নতুন সরকারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো পরিবর্তনের সঙ্গে ধারাবাহিকতার সমন্বয়। সরকার স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছে যে পূর্ববর্তী সরকারের চালু থাকা কোনো জনকল্যাণমূলক প্রকল্প হঠাৎ বন্ধ করা হবে না। বরং যতদিন না উন্নত বা বিকল্প ব্যবস্থা কার্যকর হচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত বিদ্যমান সুবিধাগুলি অব্যাহত থাকবে। এর ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হয়নি এবং প্রশাসনিক রূপান্তর প্রক্রিয়াও সুসংহতভাবে এগিয়ে চলেছে।

একই সঙ্গে সরকার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূরণের ক্ষেত্রেও দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। 'অন্নপূর্ণা যোজনা'-র মাধ্যমে দরিদ্র ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার উদ্যোগ, মহিলাদের জন্য সরকারি বাসে বিনামূল্যে যাতায়াতের সুবিধা চালুর ঘোষণা এবং সরকারি কর্মচারীদের দীর্ঘদিনের দাবির প্রেক্ষিতে সপ্তম বেতন কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত; এসব পদক্ষেপ সরকারের জনকল্যাণমূলক অঙ্গীকারের প্রতিফলন।

আজ আমরা এই পদক্ষেপগুলিকে শুধু সরকারি সিদ্ধান্ত হিসেবে নয়, বরং 'সুশাসন থেকে সুরাজ' প্রতিষ্ঠার এক সুদূরপ্রসারী জাতীয় অভিযাত্রার অংশ হিসেবে বিবেচনা করতে পারি। কারণ যে রাজ্যে আইনের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়, প্রশাসন স্বচ্ছ হয়, সীমান্ত সুরক্ষিত হয় এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেওয়া হয়, সেই রাজ্যই উন্নয়ন, নিরাপত্তা ও সামাজিক সম্প্রীতির পথে দ্রুত এগিয়ে যায়।

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গে ২০২৬ সালে গঠিত নতুন সরকার সুশাসন (গুড গভর্নেন্স), স্বচ্ছতা, আইন-শৃঙ্খলা ও প্রশাসনিক সংস্কারের লক্ষ্যে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে বলে সরকার ঘোষণা করেছে। প্রধান পদক্ষেপগুলি হলো—

(১) দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন--- প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির তদন্ত ও প্রতিরোধের জন্য বিশেষ কমিশন গঠন করা হয়েছে।

(২) আইন-শৃঙ্খলা জোরদার ও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপমুক্ত পুলিশ প্রশাসন, পুলিশকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্তভাবে কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং আইনভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

(২) আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প চালু, পূর্ববর্তী স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যবিমা প্রকল্প আয়ুষ্মান ভারতের আওতায় আনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

(৩) নিয়োগে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি, বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীদের OMR শিটের কার্বন কপি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

(৪) স্থানীয় নির্বাচনের উদ্যোগ, দীর্ঘদিন নির্বাচন না হওয়া কয়েকটি পুরসভায় নির্বাচন আয়োজনের ঘোষণা করা হয়েছে, যাতে গণতান্ত্রিক দায়বদ্ধতা বাড়ে।

(৫) বিধানসভার কার্যক্রমে স্বচ্ছতা, প্রশ্নোত্তর পর্ব, বিতর্ক ও বাজেট অধিবেশন লাইভ স্ট্রিম করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

(৬) জনগণনা ও নতুন ফৌজদারি আইন বাস্তবায়ন, দীর্ঘদিন স্থগিত জনগণনা শুরু এবং নতুন ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (BNS) ও ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা (BNSS) কার্যকর করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

(৭) কাটমানি ও সিন্ডিকেট রাজের

ফঃ ২

বিরুদ্ধে অভিযান, প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার অঙ্গীকার করা হয়েছে।

(৮) মহিলাদের জন্য বিশেষ সুরক্ষা কমিশন--- মহিলাদের ওপর সংঘটিত অপরাধের তদন্ত এবং তফশিলি জাতি ও উপজাতি শ্রেণীর নারী ও কন্যাসন্তানের সুরক্ষার জন্য পৃথক কমিশন গঠন করা হয়েছে।

(৯) সরকারি চাকরির আবেদনকারীদের বয়সসীমা বৃদ্ধি ও প্রশাসনিক সংস্কার , কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানোর জন্য কিছু নিয়ম পরিবর্তনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

(১০) বেআইনি নির্মাণ ও দখলদারির বিরুদ্ধে বুলডোজার অভিযান শুরু হয়েছে।

(১১) রাজ্য সরকার 'জিরো টলারেন্স' নীতি গ্রহণ করে অবৈধ বহুতল, কারখানা ও সরকারি জমির উপর বেআইনি দখলের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেছে।

(১২) কলকাতার তিলজলা, কসবা, বেলেঘাটা, মোমিনপুর, একবালপুরসহ বিভিন্ন এলাকায় অবৈধ নির্মাণ চিহ্নিত করে ভাঙার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

(১৩) অবৈধ নির্মাণের ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ ও জল সংযোগ বিচ্ছিন্ন করারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এই পদক্ষেপের উদ্দেশ্য হলো আইন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা, নাগরিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, দুর্নীতি ও সিন্ডিকেট-রাজের মদতে গড়ে ওঠা বেআইনি নির্মাণ রোধ করা।

তবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে এই ধরনের অভিযান নিয়ে আইনি প্রক্রিয়া, নোটিশ প্রদান ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত বিতর্কও রয়েছে, এবং সুশাসনের মানদণ্ড অনুযায়ী যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ করাও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

সুশাসনের অন্যতম লক্ষণ হলো আইনের শাসন। যে রাজ্যে বছরের পর বছর রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় অবৈধ নির্মাণ, জমি দখল ও সিন্ডিকেট রাজ চলেছে, সেখানে বর্তমান সরকার বেআইনি নির্মাণের বিরুদ্ধে বুলডোজার অভিযান চালিয়ে স্পষ্ট বার্তা দিয়েছে যে, আইনের ঊর্ধ্বে কেউ নয়। নাগরিকের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং দুর্নীতির শিকড় উপড়ে ফেলতে এই অভিযান সুশাসনের একটি দৃশ্যমান প্রতীক হয়ে উঠেছে।

(১৪) সীমান্ত সুরক্ষা ও অনুপ্রবেশ নিয়ন্ত্রণ।

(১৫) ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের জন্য বিএসএফ-কে জমি হস্তান্তর।

(১৬) নতুন সরকার গঠনের পর অনুষ্ঠিত প্রথম মন্ত্রীসভার বৈঠকেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় জমি ৪৫ দিনের মধ্যে বিএসএফের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

এরপর সরকার প্রথম পর্যায়ে ২৭ কিলোমিটার সীমান্ত অংশে বেড়া ও নিরাপত্তা পরিকাঠামো নির্মাণের জন্য জমি হস্তান্তর শুরু করে।

এই প্রকল্পের জন্য প্রাথমিকভাবে ৭৫ একর জমি বিএসএফের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে ৪৩ একর ক্রয়কৃত জমি এবং ৩২ একর সরকারি খাস জমি ছিল।

হস্তান্তরকৃত জমির মধ্যে প্রায় ১৮ কিলোমিটার অংশে কাঁটাতারের বেড়া এবং ৯ কিলোমিটার অংশে বিএসএফের বর্ডার আউটপোস্ট (BOP) ও অন্যান্য পরিকাঠামো নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে।

(১৭) সুশাসনের অন্যতম লক্ষণ হলো জাতীয় নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া। সরকার গঠনের প্রথম মন্ত্রিসভার বৈঠকেই ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের জন্য জমি হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে ৭৫ একর জমি বিএসএফের হাতে তুলে দিয়ে ২৭ কিলোমিটার সীমান্ত সুরক্ষার কাজ শুরু করা হয়েছে। দীর্ঘদিনের অচলাবস্থা দূর করে সীমান্ত সুরক্ষা, অনুপ্রবেশ রোধ এবং জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এটি একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ।

(১৮) প্রশাসনিক খরচে মিতব্যয়িতা ও সরকারি অর্থের সাশ্রয় :

নতুন সরকার জানিয়েছে যে, মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক বৈঠক ও জেলা সফরগুলিকে অপ্রয়োজনীয় জাঁকজমক থেকে মুক্ত রাখা হবে।

বড়ো মঞ্চ, ব্যাপক প্রচার, বিলাসবহুল আয়োজন এবং অতিরিক্ত প্রশাসনিক খরচ কমিয়ে সাধারণ ও কার্যকরী বৈঠকের উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

সরকারের বক্তব্য অনুযায়ী, প্রশাসনিক বৈঠকগুলির ব্যয় পূর্ববর্তী সরকারের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে কম রাখা হচ্ছে এবং সঞ্চিত অর্থ উন্নয়নমূলক কাজে ব্যয় করার নীতি গ্রহণ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, এসব পদক্ষেপের অনেকগুলি সদ্য ঘোষিত বা প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। এগুলির বাস্তব ফলাফল কতটা সফল হবে, তা সময়ের সঙ্গে মূল্যায়ন করা যাবে।

(১৯) সুশাসনের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো সরকারি অর্থের প্রতি দায়িত্বশীলতা। বর্তমান সরকার প্রশাসনিক বৈঠক ও সরকারি কর্মসূচিতে অযথা অপচয় কমিয়ে মিতব্যয়িতার নীতি গ্রহণ করেছে। জনগণের করের অর্থকে প্রচারের পরিবর্তে উন্নয়ন ও জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করার উপর জোর দেওয়া হচ্ছে।

ইতিহাস সাক্ষী, কোনো সমাজ বা দেশ কেবল অর্থনৈতিক উন্নয়নের দ্বারা মহান হয়ে ওঠে না; কোনো দেশ মহান হয়ে ওঠে সুশাসন, ন্যায়বিচার, নিরাপত্তা এবং নৈতিক নেতৃত্বের দ্বারা। পশ্চিমবঙ্গে যে পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে, তার প্রকৃত মূল্যায়ন হবে মানুষের জীবনে তার প্রভাবের মাধ্যমে। দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন, আইনের নিরপেক্ষ প্রয়োগ, সীমান্তের সুরক্ষা, স্বচ্ছ নিয়োগ ব্যবস্থা, অবৈধ কার্যকলাপের বিরুদ্ধে দৃঢ় পদক্ষেপ এবং সরকারি অর্থের সঠিক ব্যবহার--- এসবই একটি দায়িত্বশীল ও জনমুখী সরকারের পরিচায়ক। তবে সুশাসন কোনো একদিনের বিষয় নয়— এটি একটি অবিরাম সাধনা। সরকার, প্রশাসন ও সমাজ; সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টাতেই সুশাসনের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়। তাই আমাদের প্রত্যাশা, এই উদ্যোগগুলি কেবল ঘোষণার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে বাস্তব ফলাফলে পরিণত হবে এবং পশ্চিমবঙ্গ আবার জ্ঞান, সংস্কৃতি, কর্মসংস্থান, নিরাপত্তা ও সামাজিক সম্প্রীতির ক্ষেত্রে দেশের অগ্রণী রাজ্যে পরিণত হবে। □

মোগল শাসন আর তৃণমূল শাসনের পতনের কারণ একই

ঔরঙ্গজেবের নরক সদৃশ ভারতবর্ষ যেমন ফিরে পেয়েছিল তার স্বাধীন সত্তা, এবার পশ্চিমবঙ্গেও মমতা ব্যানার্জি তথা তৃণমূল কংগ্রেসের পতনের পর সেই স্বর্গে ফিরে যাবে। ফিরে যাবে আবার হারিয়ে যাওয়া সোনার পশ্চিমবঙ্গে।

সুজিত রায়

১৭০৭ সালে ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু এবং মোগল শাসনের পতনের সূচনা কেবলমাত্র একটি ঐতিহাসিক ঘটনা নয়। পরবর্তী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে মোগলি পরম্পরার সমাপ্তি ছিল একটি ঐতিহাসিক অনিবার্যতা। অবিভক্ত বঙ্গের বুকে পলাশীর প্রান্তরে নবাব সিরাজউদ্দৌল্লার নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতার যে সূত্রপাত হয়েছিল, তার ২৬৯ বছর পরে সেই বঙ্গের মাটিতেই প্রকট হলো আর এক সমান্তরাল ঐতিহাসিক অনিবার্যতা— তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের পতন এবং ভারতবর্ষের সনাতনী রাজনৈতিক শক্তি বিজেপির উত্থান। যাকে ঐতিহাসিকরা শুধু পশ্চিমবঙ্গের বুকে দ্বিতীয় স্বাধীনতা প্রাপ্তি বলেই জয়োল্লাস করছেন না। বলা হচ্ছে, বিধর্মী প্রশাসনের দীর্ঘ পনেরো বছর ধরে কালিমালিপ্ত পশ্চিমবঙ্গ ফিরে পেল তার হিন্দুত্ব ঘরানার সনাতনী ঐতিহ্য। প্রায় ২৭০ বছরের দীর্ঘ সংগ্রামের পর গৈরিক সূর্যোদয় হলো বলা যায়।

নিবন্ধের এই প্রারম্ভিক সূচনায় চরম দুর্নীতিপরায়ণ তৃণমূল কংগ্রেস এবং মনগড়া ন্যারেটিভ নির্ভর বাম রাজনীতির ধারক বাহকরা নিঃসন্দেহে বিতর্ক তুলবেন যে, পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরম্পরাকে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ের সঙ্গে বর্তমান সময়ের তুল্যমূল্য বিচার না করে, মোগল শাসনের সঙ্গে তুলনা করা অর্থহীন। কিন্তু একজন ইতিহাস সচেতন প্রাবন্ধিক হিসেবে বলা যায়— আজ ঠিক যে সন্ধিক্ষণে পশ্চিমবঙ্গ ও বাঙ্গালি দাঁড়িয়ে, তখন কোনোভাবেই অস্বীকার করা যাবে না, আজ তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের চূড়ান্ত পতন একমাত্র তুলনীয় মোগল শাসনের পতন এবং পতনের কারণ সমূহের সঙ্গে।

একবার মিলিয়ে দেখা যাক, পশ্চিমবঙ্গে গত ১৫ বছরে মমতা ব্যানার্জি নেতৃত্বাধীন তৃণমূলি জমানার সঙ্গে মোগল শাসনে মিল কোথায় কোথায়?

প্রেক্ষাপট : মোগল শাসনের পতন

দীর্ঘ ৩৪ বছরের বাম শাসনের অপশাসন এবং গণআন্দোলনের নামে শিল্পবিরোধী আন্দোলন গড়ে ২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গের ভোটারদের মানসিকভাবে বিভ্রান্ত করে মহা ধুমধাম করে রাজ্য প্রশাসনের ক্ষমতা দখল করে তৃণমূল কংগ্রেস। ওই বছর ১৩ মে মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ গ্রহণের পরদিন থেকেই শুরু হয়ে যায় অপশাসনের এক নতুন নমুনা যা বামফ্রন্টের ৩৪ বছরের সমস্ত অপশাসনের ইতিহাসকে ম্লান করে দিয়েছিল।

মমতা ব্যানার্জির স্বৈরাচারিতা

ঔরঙ্গজেব যদি হন স্বৈরাচারী বাদশা, তাহলে মমতা ব্যানার্জি হলেন তাঁর স্ত্রীলিঙ্গের এক আদর্শ ক্লোন। কংগ্রেস ছেড়ে বেরিয়ে এসে গঠন করেছিলেন তৃণমূল কংগ্রেস প্রায় নিঃস্ব হয়ে। কিন্তু তাঁর কপালে ছিল মিডিয়া-প্রেম। তাঁর রাজনৈতিক আদর্শ বলে কিছু ছিল না। একজন স্বৈরাচারী রাজনীতিবিদ যেমন মুখে আদর্শের ধুয়ো তোলেন কিন্তু পাশাপাশি রাজার নীতিকে অস্বীকার করে দেশের সংবিধানকেও ধূলিসাৎ করে দেন নিজের অস্তিত্ব জাহির করার জন্য, মমতা ব্যানার্জি ছিলেন তার শ্রেষ্ঠ নমুনা। যেমন :

(১) তিনি প্রকাশ্যে বলতেন—দলটি তৈরি করেছেন তিনি। তাই এই দলে অন্য কারও প্রধান হওয়ার অধিকার নেই। ফলত তিনিই ছিলেন দল। বাকিরা অজ্ঞাবাহী দাসানুদাস।

(২) তৃণমূল কংগ্রেস ছাড়া রাজ্যের সব দলের মুখে তিনি লুকোপ্লাস্ট লাগিয়ে দিয়েছিলেন। কারণ তিনি মনে করতেন, রাজ্যে যোগ্য রাজনৈতিক দল একটি--- তৃণমূল কংগ্রেস এবং নেতা বা নেত্রী একজনই— তিনি নিজে। বাকিরা সকলে হয় মাওবাদী নয়তো ফ্যাসিস্ট, দেশদ্রোহী।

(৩) তাঁর কাছে গোটা ভারত ছিল চোর, দুর্নীতিগ্রস্ত। সততার প্রতীক একমাত্র তিনি মমতা ব্যানার্জি।

(৪) তাঁর মতে পশ্চিমবঙ্গের মেয়ে, তিনি ছিলেন একাই। বাকিরা এলেবেলে।

এই সবকটি নমুনাই প্রমাণ করে তিনি আসলে ছিলেন ঔরঙ্গজেবের ক্লোন। যদিও স্ত্রীলিঙ্গ।

দল তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তি

দল ছিল তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তি। তাই দলের সাধারণ সচিব পদে বসান ভাইপো অভিষেক ব্যানার্জিকে, যার কোনো রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ছিল না। যোগ্যতা ছিল না। শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন আজও অনেক। অকালপক্ব, দুর্বিনীত এবং চরম দুর্নীতিগ্রস্ত এক যুবক যার থেকে বহু অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ তৃণমূল কংগ্রেসে ছিলেন বা আছেন। কিন্তু হালে পানি পাননি তাঁরা। ফলত নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে তাঁরা দলনেতা নয়, দলদাসে পরিণত হয়েছেন এবং মমতা ব্যানার্জিকে খুশি করতে নির্বিচারে দুর্নীতি করেছেন সর্বস্তরে। তার ফলে রাজ্য পরিণত হয়েছিল একটি অশিক্ষিত, দুর্বিনীত, বিশৃঙ্খল, অপসংস্কৃতি চরমতম দুর্নীতিপরায়ণ, রাজনৈতিক ভাবে আদর্শহীন এক দঙ্গল

'চোর'-ডাকাতের রাজত্বে।

আর্থিক দুর্নীতি

মাত্র ১৫ বছরের শাসনে রাজ্যের অর্থনীতি শূন্য কলসীতে পরিণত হয়েছে। এর প্রধান কারণ, রাজস্ব আয়ে ব্যর্থতা, শিল্পগঠনে নিরুৎসাহ, ভাতার নামে ভোট কেনার জন্য শতাধিক প্রকল্প এবং সমীক্ষাবিহীন সামাজিক প্রকল্পখাতে লক্ষ লক্ষ কোটি টাকার অপব্যয় এবং এসবের সঙ্গে সমানভাবে তাল মিলিয়ে ব্যানার্জি পরিবারের সামগ্রিকভাবে আলাদিনের সম্পদ বোঝাই এক আশ্চর্য গুহার মালিক/মালকিন হয়ে ওঠা। দুর্নীতির বোঝা এতটাই যে তাল সামলাতে না পেরে মাত্র ১৫ বছরের রাজ্যের ঋণের বোঝার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৮ লক্ষ কোটি টাকা। অর্থাৎ আজ যে শিশু জন্ম নিচ্ছে তার মাথায় ঋণের বোঝা ৮০ হাজার টাকা। তুলনা করা যেতে পারে ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের আর্থিক নীতির সঙ্গে যা তাঁর উত্তরসূরীদের আমলে প্রকট হয়ে উঠেছিল। যেমন এখন তৃণমূল সরকারের পতনের পর নতুন সরকারকে রাজ্য সামলাতে হিমসিম খেতে হবে। ভিক্ষাপাত্র নিয়ে দাঁড়াতে হবে কেন্দ্রের কাছে।

ধর্মীয় বিদ্বেষ

মমতা ব্যানার্জি দাবি করেন, তিনি হিন্দু ব্রাহ্মণ ঘরের সন্তান। পদবিও তাই বলে। কিন্তু চরিত্রগতভাবে তিনি যদি হিন্দু হন ২০ শতাংশ তো তিনি মুসলমান ৮০ শতাংশ। এর কারণ একটাই— তিনি জানেন, তাঁকে ক্ষমতায় কোনো হিন্দু টিকিয়ে রাখতে পারবে না। তাই তিনি মুসলমান মহিলা সেজে হিজাব পরেন, নমাজ পড়েন, ইফতার পার্টিতে সানন্দে খাওয়াদাওয়া করেন, মৃতদেহে জানাজার নমাজ পড়েন, পিরের দরগায় চাপান চাদর। তাঁর ১৫ বছরের শাসনকালে তিনি সবচেয়ে বেশি অর্থ ব্যয় করেছেন মাদ্রাসায়, মুসলমানদের স্কলারশিপ দেওয়ায়, জাল ওবিসি সার্টিফিকেট দিয়ে মুসলমানদের চাকরির পরীক্ষায় বসার যোগ্যতার সম্মান দেওয়ায় এবং ইমাম- মোয়াজ্জেম ভাতা দিয়ে মসজিদগুলির অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখায়। একেবারে ঔরঙ্গজেবের ট্রু কপি। ঔরঙ্গজেব মুসলমান হয়ে হিন্দুদের নিকেশ করতেন। আর মমতা ব্যানার্জি হিন্দু হয়ে হিন্দুদেরই নিকেশ করেছেন। অর্থাৎ মেরুদণ্ডহীন করে দিয়েছেন।

কেন্দ্র বিরোধিতা

ঔরঙ্গজেবের শাসনে কেন্দ্রীয় ভরকেন্দ্র ছিলেন তিনি নিজেই। তাই নিজের বিরোধিতার সুযোগ ছিল না। কিন্তু সামন্ত রাজা, জায়গিরদার ও হিন্দু জমিদারদের তীব্র বিরোধী ছিলেন। অর্থের সমস্যা হলেই কর চাপানো হতো স্থানীয় স্তরের প্রশাসকদের ওপর। আর তা না পেলেই চলত স্বৈরাচারীর অত্যাচার। পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের আমলে চলেছে সেটাই ভিন্ন পথে। এখানে রাজ্য প্রশাসক হিসেবে তিনি জুলুমবাজি চালিয়েছেন কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর। ভারত একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর দেশ। এখানে কেন্দ্রই মূল প্রশাসক। রাজ্য সরকারগুলি সহায়ক প্রশাসক। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে গত ৫০ বছর ধরে একটানা করে আসা হয়েছে কেন্দ্র বিরোধিতা যা আর কোনো রাজ্য করেনি। প্রথম ৩৫ বছর এই নীতির ধারক-বাহক ছিল বামফ্রন্ট। কারণে-অকারণে তারা যে কেন্দ্র-রাজ্য সংঘাতের আবহ গড়ে তুলেছিল মমতা ব্যানার্জি সেই আবহকে আরও অনেক বেশি মাত্রায় বিষাক্ত করে তুলেছেন। তাঁর শাসনকালে তাঁর হাবভাব রচনা করেছে এক নতুন ইতিহাস--- কেন্দ্রীয় সরকার তথা প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী-সহ সমস্ত মন্ত্রকের সঙ্গে বছরভর কালীঘাটের কলতলার ঝগড়া বজায় রাখা। একটি অঙ্গরাজ্য হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রীয় সমস্ত নীতি নিয়মকে অবজ্ঞা করে বিশ্বের দরবারে বঙ্গ ও বাঙ্গালিকে 'ঝগড়ুটে' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এর কারণ একটাই— মানুষের কাছে নিজের লড়াকু ভূমিকাকে তুলে ধরে ভোট ভিক্ষা করা। কিন্তু অশিক্ষা ও অবোধতার সীমা এতটাই যে একবারও মাথায় আসেনি, একটি অঙ্গরাজ্য কেন্দ্রের সঙ্গে কোমর বেঁধে ঝগড়া করলে শিল্প আসে না, উন্নয়ন থমকে যায়। অন্য রাজ্য প্রতিযোগিতায় এগিয়ে যায়। 'এগিয়ে বাংলা' স্লোগানের ব্যানারে, হোর্ডিঙে রাজ্যকে মুড়ে দিলেও পশ্চিমবঙ্গ ক্রমশ পিছন দিকেই এগিয়েছে।

আজ রাজ্যে প্রায় দশ হাজার স্কুল বন্ধ হয়ে গেছে। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ধুঁকছে ছাত্র-ছাত্রীর অভাবে, পরিকাঠামোর অভাবে। স্কুল-কলেজে শিক্ষক নেই, ছাত্র নেই। গ্রামে-শহরে শিল্প নেই, ব্যবসা নেই, ঘরে ঘরে বেকার, তাদের চাকরি নেই। এ যেন সেই কবি অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের কবিতার 'নেই-রাজ্যের' প্রত্যক্ষ ছবি, যেখানে যার হাত আছে তার কাজ নেই। আর যার হাত আছে, তার ভাত নেই। এক ভয়াবহ সার্বিক দুর্ভিক্ষপীড়িত পশ্চিমবঙ্গ, যে দিনে লাইন দেয় ভাতা-র জন্য, রাতে লাইনে দাঁড়ায় বাংলা মদের পাউচের জন্য। যাঁরা ইতিহাস পড়তে ভালোবাসেন, তাঁরা আর একবার চোখ বোলাবেন মোগল শাসনের পতনের সময়কার ছবির মতো স্পষ্ট অক্ষরগুলির ওপর। এটা নিশ্চিত, সবাই মমতা ব্যানার্জির ১৫ বছরের শাসন আর ঔরঙ্গজেবের ৪৯ বছরের শাসনের মধ্যে মিল খুঁজে পাবেনই। পাবেন, কারণ দু'জনেই সেই ঈশ্বরের সৃষ্টি যিনি মনে করতেন— যে হাতে মানুষ সৃষ্টি করা যায়, সেই হাতেই দরকারে শয়তানও সৃষ্টি করা যায়। করতে হয় যখন পৃথিবীর প্রয়োজন পড়ে।

৪৯ বনাম ১৫

অনেক মাস, অনেক বছর, অনেক দিনের তফাত দুটি প্রশাসনের। তাহলে মিলটা কোথায়? কবি আমীর খসুরু প্রথমবার কাশ্মীরের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে ফার্সি ভাষায় একটি কবিতা লিখেছিলেন—

'অগর ফিরদৌস বর রূ-এ জমিন অস্ত
হমীন অস্ত-ও, হমীন অস্ত-ও, হমীন অস্ত-ও।'

অর্থাৎ স্বর্গ যদি কোথাও থেকে থাকে, এখানে, তা এখানে, তা এখানেই।

৪ মে-র আগে যদি আমীর খসরু পশ্চিমবঙ্গে পা রাখতেন, তাহলে হয়তো লিখেতেন—

'অগর দুশখ বর-রূ-এ রয়ে জমীন অস্ত
হমীন অস্ত-ও, হমীন অস্ত-ও, হমীন অস্ত-ও।'

অর্থাৎ নরক যদি কোথাও থেকে থাকে, এইখানে তা এইখানে তা এইখানেই।

আজ্ঞে হ্যাঁ, 'দুশখ' শব্দের অর্থ নরক যেটিকে 'দোজখ' বা 'জাহান্নাম' ও বলা যায়।

আশা করি, ঔরঙ্গজেবের নরক সদৃশ ভারতবর্ষ যেমন ফিরে পেয়েছিল তার স্বাধীন সত্তা, এবার পশ্চিমবঙ্গেও মমতা ব্যানার্জি তথা তৃণমূল কংগ্রেসের পতনের পর সেই স্বর্গে ফিরে যাবে। ফিরে যাবে আবার হারিয়ে যাওয়া সোনার পশ্চিমবঙ্গে। □

রাজ্যের হৃতগৌরব ফিরিয়ে আনতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাথমিক উদ্যোগ প্রশংসনীয়

'দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন'— এই লক্ষ্য নিয়ে এরাজ্যে বিজেপি পরিচালিত সরকার যে কাজ করে চলেছে তা এক কথায় অভূতপূর্ব।

আনন্দ মোহন দাস

স্বাধীনতার পরে প্রথম পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নেতৃত্বে রাজ্যের জনগণ সুশাসনের স্বাদ পেতে আরম্ভ করেছে। বিগত ৫০ বছর পরে রাজ্যে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার একই দলের হয়েছে অর্থাৎ এত বছর পর এরাজ্যে 'ডবল ইঞ্জিন সরকার' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে যেভাবে প্রথম পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ব্যাটিং শুরু করেছেন তাতে এককথায় ছক্কার পর ছক্কা হাঁকাচ্ছেন। সম্পূর্ণ মন্ত্রীসভা গঠন না হলেও মুখ্যমন্ত্রী অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই যে সমস্ত দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তা পশ্চিমবঙ্গের আপামর জনসাধারণের কাছে তাঁর জনপ্রিয়তা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। ভারতীয় জনতা পার্টি-র সংকল্পপত্রের প্রত্যেকটি সংকল্প রূপায়ণে সদর্থক ভূমিকা পালন করে চলেছেন। বিজেপির সংকল্প ছিল 'ভয় আউট ভরসা ইন'— তা ইতিমধ্যে মানুষ অনুভব করছেন। তাই মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে তৃণমূল কংগ্রেসের অন্যায়, গুন্ডামি, তোলাবাজির বিরুদ্ধে প্রতিবাদে নেমে পড়েছেন। বিশেষ করে মহিলারাও দিকে দিকে তৃণমূলের নেতাদের বাড়ি ঘেরাও করে বিহিত চাইছেন, টাকা ফেরত চাইছেন,অত্যাচারের জবাব চাইছেন।

প্রথমেই তিনি পূর্বতন সরকারের 'শাসকের আইন' প্রত্যাহার করে 'আইনের শাসন' প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্যোগী হয়েছেন। বিজেপির নীতি অনুযায়ী প্রশাসন ও দলকে পৃথক রেখেছেন। পুলিশ-সহ প্রশাসনের সর্বস্তরে দলীয় হস্তক্ষেপ বন্ধ করে তাদের প্রশাসনিক স্বাধীনতা ফিরিয়ে দিয়েছেন। আইএএস, আইপিএস অফিসারদের স্বাধীনভাবে কাজ করার স্বাধীনতা ফিরিয়ে দিয়েছেন। প্রশাসনিক বৈঠকে আগের মতো রাজনৈতিক আলোচনা বন্ধ করেছেন। যার ফলে আজকের পুলিশ ও প্রশাসন যে অনেক বেশি সক্রিয় তা মানুষ প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ করছে। পূর্ববর্তী সরকারের সর্বক্ষেত্রে দলীয়করণ ও হস্তক্ষেপের ফলে পুলিশ ও প্রশাসন নিষ্ক্রিয় ছিল। এর ফলে আইন-শৃঙ্খলার চরম অবনতি লক্ষ্য করা গিয়েছিল। দুর্বৃত্তায়নের শিকার হয়ে বহু মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি-সহ সর্বস্তরে গুন্ডামি, তোলাবাজি, সিন্ডিকেট-রাজ কায়েম হয়েছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্ত, আদালতের রায় এবং ভারতীয় সংবিধানের বিরোধিতা করাই ছিল তৃণমূল সরকারের একমাত্র কাজ; বর্তমান সরকারের আমলে তোলাবাজির অভিযোগ এলেই গ্রেপ্তার হতে হচ্ছে।

বিগত নির্বাচনে মানুষ এই নৈরাজ্যের অবসানের লক্ষ্যে বিজেপিকে দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করেছেন। তাই এখন বিজেপির দায়িত্ব ও মানুষের প্রত্যাশা অনেক বেড়ে গেছে। মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে নতুন সরকার অনেকগুলি ইতিবাচক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবে মনে রাখা দরকার, বিগত বামফ্রন্ট সরকারের ১,৮৭,০০০ কোটি টাকা ঋণকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রায় আট লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছে দিয়েছেন। রাজ্যের অবস্থা ভাঁড়ে মা ভবানী। তবে নতুন রাজ্য সরকার দুর্নীতি মুক্ত প্রশাসন ও কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতায় এই অন্তঃসারশূন্য আর্থিক অবস্থার মোকাবিলা করতে বদ্ধপরিকর। একথা অনস্বীকার্য যে, অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই রাজ্য সরকার বেশ কিছু যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

(১) কেন্দ্রীয় সরকারের বহুদিনের দাবি পূরণে ও বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ রুখতে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকার জমি হস্তান্তর প্রক্রিয়া বাস্তবায়িত করতে প্রথম ক্যাবিনেটেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। ইতিমধ্যে সীমান্তে ২৭ কিলোমিটার দীর্ঘ কাঁটাতারের বেড়া এবং বিএসএফ-এর চেকপোস্ট নির্মাণের লক্ষ্যে রাজ্য সরকার ৬০০ হেক্টর জমি বিএসএফ-কে হস্তান্তর করেছে। এছাড়াও দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে অত্যন্ত সংবেদনশীল ও গুরুত্বপূর্ণ জায়গা চিকেন নেক এলাকাতেও ১২১ হেক্টর জমি হস্তান্তর করা হয়েছে। ইতিমধ্যে সীমান্ত সুরক্ষা করতে বেড়া দেওয়ার কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। পূর্বতন রাজ্য সরকারের কাছে কেন্দ্রের বহুবার আবেদন সত্ত্বেও প্রয়োজনীয় জমি হস্তান্তর করা হয়নি। কিন্তু নবনির্বাচিত সরকার দ্রুততার সঙ্গে সেই সমস্যার সমাধানে সক্রিয় হয়েছে। রাজ্য সরকার আইএএস অফিসার নন্দিনী চক্রবর্তীকে বাকি জমি দ্রুত হস্তান্তরের বিষয়টি বিশেষভাবে দেখার দায়িত্ব দিয়েছে। আগের সরকার কলকাতা হাইকোর্টের আদেশ সত্ত্বেও জমি হস্তান্তরের সদিচ্ছা দেখায়নি। এর ফলে ব্যাপক সংখ্যায় বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গা মুসলমান অনুপ্রবেশ ঘটেছে যা দেশের নিরাপত্তা ও সংহতির পক্ষে বিপজ্জনক। অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের বিষয়ে বিজেপির নীতিগত সিদ্ধান্ত হলো— 'Detect—Delete—Deport'। সেই লক্ষ্যে জেলায় জেলায় হোল্ডিং সেন্টার চালু করে ইতিমধ্যে কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। এজন্য অনেক বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গা মুসলমান নিজেদের দেশে ফেরার জন্য সীমান্তে লাইন লাগিয়েছে। আগের সরকার এদের মদত দিয়ে ভোটব্যাংকের রাজনীতি করেছে। অবৈধভাবে বিভিন্ন সুযোগসুবিধা পাইয়ে দিয়েছে। সেই পরিস্থিতির পরিবর্তন করতে বর্তমান সরকার ইতিমধ্যেই ইতিবাচক

পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের 'আয়ুষ্মান ভারত' প্রকল্প রাজ্যে চালু করে বহুদিনের জনগণের দাবিকে পূরণ করেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। গোটা দেশের মধ্যে একমাত্র রাজ্য হলো 'পশ্চিমবঙ্গ' যেখানে এই প্রকল্প থেকে জনগণকে বঞ্চিত করে রেখেছিল তৃণমূল সরকার যা ইতিমধ্যে বর্তমান রাজ্য সরকার চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ও জনকল্যাণমূলক পদক্ষেপ। এছাড়াও রাজ্য সরকার কিষাণ নিধি, বিশ্বকর্মা যোজনা, জিরামজি প্রকল্প (গ্রামীণ রোজগার যোজনা)-সহ কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্ত জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলি রাজ্যে চালু করার জন্য নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এর ফলে কেন্দ্রের সমস্ত প্রকল্পের সুফল পাবেন রাজ্যবাসী এবং রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের সমন্বয়ে অনেক উন্নয়নমূলক কাজ শুরু হয়ে যাবে যা রাজ্যের পক্ষে মঙ্গলজনক। এর ফলে রাজ্যজুড়ে আর্থিক কর্মচাঞ্চল্যও শুরু হয়ে যাবে। পূর্ববর্তী তৃণমূল সরকার স্বেচ্ছাচারিতার কারণে কেন্দ্রীয় প্রকল্প থেকে বঞ্চিত রেখেছিল রাজ্যবাসীকে। বর্তমান রাজ্য সরকারের আমলে প্রতিনিয়ত কেন্দ্র বিরোধিতার মানসিকতা থেকে মুক্তি পেয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। এছাড়া কেন্দ্রীয় পূর্ত মন্ত্রক ও জাতীয় সড়ক নির্মাণ কর্তৃপক্ষ বারবার জমির জন্য পূর্বতন সরকারের কাছে আবেদন করা সত্ত্বেও তারা সহযোগিতা করেনি। এর ফলে বেশ কয়েকটি জাতীয় সড়কের কাজ বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে। নতুন সরকার সমস্ত বাধা দূর করতে এগিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং পরিকাঠামো নির্মাণে ও নতুন সড়ক নির্মাণে আরও জমির ব্যবস্থা করার আশ্বাস দিয়েছেন। স্বাভাবিকভাবেই কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের যৌথ প্রয়াসে এরাজ্যে আর্থিক উন্নয়ন ও শিল্পায়নের পথ যে প্রশস্ত হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। জানা গিয়েছে যে, রেলমন্ত্রী এমাসে রাজ্যে এসে পূর্বতন রাজ্য সরকারের অসহযোগিতায় আটকে থাকা ৬১টি রেল প্রকল্প চালুর বিষয়ে বিশদভাবে ঘোষণা করবেন এবং রাজ্য সরকারের উদ্যোগেই আগামীদিনে এই কাজ শুরু হতে চলেছে। এই প্রকল্পগুলি চালু হলে যোগাযোগ ও পরিবহণ ক্ষেত্রে দিগন্ত খুলে যাবে।

নতুন সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্কুল, কলেজগুলির ম্যানেজিং কমিটিগুলিকে ভেঙে দিয়ে শিক্ষাঙ্গনকে রাজনীতি মুক্ত করার উদ্যোগ প্রশংসনীয়। কারণ গত সরকারের আমলে শিক্ষা ক্ষেত্রে কমিটিগুলিতে রাজনৈতিক দাদাদের আধিপত্যের ফলে স্কুল, কলেজ কর্তৃপক্ষ স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারতেন না। নতুন সরকারের পদক্ষেপের ফলে শিক্ষাঙ্গনগুলি রাজনীতি মুক্ত হবে। এছাড়া শিক্ষক ও সরকারি কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে স্বচ্ছ পরীক্ষা ব্যবস্থা, ওএমআর শিটের কপি দেওয়া এবং ইন্টারভিউতে কম নম্বর রাখার সিদ্ধান্ত খুবই যুক্তিসঙ্গত। যদিও সরকারি ক্ষেত্রে কর্মী নিয়োগের জন্য বিস্তারিত নীতি প্রণয়ন আগামী বাজেটে দেখা যাবে বলে মুখ্যমন্ত্রী আশ্বস্ত করেছেন। কারণ পূর্বতন সরকারের আমলে নিয়োগ দুর্নীতিতে এরাজ্যের ২৬,০০০ শিক্ষকের চাকরি চলে যাওয়া দেশের ইতিহাসে প্রথম। সমস্ত সরকারি দপ্তরে কর্মচারী নিয়োগ বহুদিন বন্ধ রয়েছে। অনেকেরই বয়স পেরিয়ে গেছে। তাই প্রতিশ্রুতি মতো নতুন সরকার চাকুরির জন্য আবেদনের ক্ষেত্রে পাঁচ বছর বয়স সীমা বাড়িয়ে দিয়েছে এবং এখন থেকে চাকরির দরখাস্ত করার জন্য কোনো রকম ফি লাগবে না বলে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন। এই সিদ্ধান্তে বেকার চাকরিপ্রার্থীদের সুরাহা হবে। কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যে সরকার সমস্ত বিভাগের শূন্য পদের হিসাব শীঘ্র জমা করার জন্য বিভাগীয় প্রধানদের নির্দেশ দিয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী রাজ্য সরকার সমস্ত সরকারি স্কুল, মাদ্রাসা ও সরকারি অনুষ্ঠানে পূর্ণাঙ্গ 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীত বাধ্যতামূলক করেছে। এরাজ্যের নবনির্বাচিত সরকারের পক্ষ থেকে এটি একটি সাহসী ও প্রশংসনীয় পদক্ষেপ।

তৃণমূল সরকারের চালু করা ইমাম, মোয়াজ্জেম, পুরোহিত ভাতা বন্ধ করে সেই টাকা শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যয় করার বিষয়ে নতুন সরকারের গৃহীত সিদ্ধান্ত একেবারে সঠিক ও প্রশংসনীয়।

আরও কিছু ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে রাজ্য সরকার বিভিন্ন আইন বলবৎ করেছে। রাস্তায় বসে নমাজ পড়া বন্ধ করা-সহ ইদের দিন রেড রোডের মতো ব্যস্ত রাস্তা দখল করে নমাজ পড়াও বন্ধ করা হয়েছে। তার ফলে যানবাহন চলাচলে কোনরকম বাধা সৃষ্টি হয়নি। সমস্ত মসজিদে আজান/নমাজের সময় মাইকের আওয়াজ ৬৫ ডেসিবেলের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার নির্দেশ জারি করে সাধারণ মানুষকে শব্দ দূষণের হাত থেকে রক্ষা করেছে নবনির্বাচিত সরকার। এই ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টের পুরোনো আদেশকে কার্যকর করেছে এবং এরাজ্যে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের মতো ইদের ছুটি একদিন করা হয়েছে। বিগত সরকারের দ্বারা মুসলমানদের তোষামোদ করে প্রবর্তন করা ২ দিনের ছুটি বাতিল করে কর্মসংস্কৃতি ফিরিয়ে আনতে উদ্যোগ নিয়েছে বর্তমান রাজ্য সরকার। রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের অফিসে আসা ও ফিরে যাওয়ার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়ও বেঁধে দেওয়া হয়েছে। এটি একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। বিজেপির সংকল্প পত্র অনুযায়ী সরকার গঠনের ৭ দিনের মধ্যে সরকারি কর্মচারীদের সপ্তম বেতন কমিশন নিয়োগের ক্ষেত্রে অনুমোদন দিয়েছে রাজ্য ক্যাবিনেট। কর্মচারীদের বহুদিনের দাবি পূরণকে অগ্রাধিকার দিয়েছে রাজ্য মন্ত্রীসভা।

কলকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর নেতৃত্বে বিগত সরকারের প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির বিষয়ে একটি কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এছাড়া নারী ও শিশুদের উপর যে অন্যায়, অত্যাচার ও নির্যাতন হয়েছে তা খতিয়ে দেখতে কলকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি সমাপ্তি চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে আর একটি মহিলা কমিশন গঠিত হয়েছে।

সরকার গঠনের মাত্র ১৫ দিনে জনকল্যাণের লক্ষ্যে যে সমস্ত দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, তা এককথায় অভূতপূর্ব। বেআইনি নির্মাণ ভাঙতে যেভাবে দিকে দিকে বুলডোজার চলেছে তাতে তোলাবাজ ও তৃণমূল নেতারা বিপদে পড়েছে। তৃণমূল-আশ্রিত দুষ্কৃতী-সহ পাড়ার মস্তান ও তোলাবাজরা দিকে দিকে গ্রেপ্তার হচ্ছে। 'দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন'— এই লক্ষ্য নিয়ে এরাজ্যে বিজেপি পরিচালিত সরকার যে কাজ করে চলেছে তা এক কথায় অভূতপূর্ব। এর ফলে সবচেয়ে বড়ো পরিবর্তন হয়েছে হিন্দু জনমানসে। সরকারের প্রতি হিন্দু সমাজের ভরসা, আস্থা ও বিশ্বাস বেড়েছে। খুব অল্পদিনের অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায় যে, বিজেপি পরিচালিত রাজ্য সরকার আগামীদিনে এরাজ্যের হৃতগৌরব ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হবে। □

রোহিঙ্গা নয়, বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী নয়, প্রকৃত ভারতবাসীই শুধু আমার ভাই

অভিজিৎ দাশগুপ্ত

২০২৬ সালের প্রায় অর্ধেক সময় চলে গেল পশ্চিমবঙ্গের জনগণকে এটুকু বোঝাতে যে, আর দেরি নয়, ধরব মোরা, হাতে হাতে ধরব।

এক নাগাড়ে পনেরো বছর ধরে অপশাসনের বিশ্বরেকর্ড গড়ে এবারে ভোটের আগে তৃণমূলনেত্রী আর তাঁর সুযোগ্য ভাইপো আবার স্বপ্ন দেখছিলেন আর অন্ধ অনুগামীদের বলছিলেন যে, চার তারিখ, মানে ২০২৬ সালের ৪ মে ভোট গণনার দিন বেলা বারোটায় একবার পৌঁছতে দাও। তারপর দেখতে থাকো আমরা তৃণমূল পার্টি সকলের কী হাল করি। সত্যি বলতে কী, আমাদের, আপামর জনসাধারণের মাঝেমাঝেই বুক ঢিবঢিব করছিল এই ভেবে যে, ওরা সারা বছর এত ক্যালকুলেশন করে, পাড়ার বা এলাকার যে কোনও মানুষের নাড়ি ধরে বা না ধরে হয়তো এটাও বলে দিতে পারে, কোন ভোটার বুথে ঢুকে কোন দলের কোন প্রার্থীকে ভোট দিয়েছে।

সবই অবাস্তব চিন্তাধারা সন্দেহ নেই। নাহলে ভোট আর গণনার দিন রাতেবেলায় রাজ্যজুড়ে দু'লক্ষ সিআরপিএফের বুটের আওয়াজে আরও জমিয়ে ঘুম আসত রাজনীতি সচেতন আপামর বাঙ্গালির? চিফ ইলেকশন কমিশনার জ্ঞানেশকুমার এবার ঠিকই করে ফেলেছিলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র জবরদস্ত মদতে পশ্চিমবঙ্গের ভোটকে এবার এমন জায়গায় নিয়ে যেতে হবে যে, হাজার চেষ্টা করেও শাসকদলের দুর্বৃত্তরা তাতে দাঁত ফোটাতে না পারে। দিল্লির তরফে বলা হয়েছিল ২০০২ ভিত্তি ধরে প্রতিটি সন্দেহজনক ভোটারকে ফ্যামিলি ম্যাপিঙের আওতায় নিয়ে আসতে হবে। পদ্ধতির নাম এসআইআর অর্থাৎ স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন। এই পদ্ধতিতে ভোটার গণনা করতে গিয়ে বহুক্ষেত্রেই বিড়ম্বনা বেড়েছে। কিন্তু অশেষ উপকার যেটা হয়েছে তা হলো, অতীতের ভোটার তালিকায় মাথা গুঁজে রাখা লক্ষ লক্ষ গোলমেলে ভোটারের প্রকৃত পরিচয়ের পর্দা ফাঁস হয়ে আগের চেয়ে অনেক স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে তালিকাভুক্ত ভোটারদের আসল পরিচয়। এসআইআরে যাদের নাম আছে আর যাদের নাম নেই, তাদের অন্তহীন ভোগান্তির ইতিবৃত্ত তৃণমূল সরকারের তরফে অক্লান্তভাবে প্রচার করেও বিশেষ লাভ হয়নি। কারণ নির্বাচন এরপর যখন সত্যি এসে পড়ল, দেখা গেল, প্রতিটি কেন্দ্রের প্রতিটি বুথে ৯৩/৯৪ শতাংশ ভোট পড়েছে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে। তার মানে কী দাঁড়াল? তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেওয়া যায় হয়রানির একেবারে শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল মানুষ, পাশাপাশি এটাও বলতে হবে সেই হয়রানি থেকে নিজেকে মুক্ত করে নির্বাচকমণ্ডলীর মূল স্রোতে স্থায়ীভাবে অন্তর্ভুক্ত হতে চেয়েছেন বেশিরভাগ ভোটার। যার পরিণাম, ২০২৬ সালের এই অতি বিরল, ব্যতিক্রমী বিধানসভা নির্বাচন।

এসআইআরের দাপট যে কতখানি গভীরে গিয়ে কাজ করেছিল সাধারণ মানুষের মনে, ৪ মে দুপুর থেকে তার অভিঘাত বড়ো বড়ো ঢেউয়ের চেহারা নিয়ে আছড়ে পড়ে গোটা পশ্চিমবঙ্গে। উত্তরবঙ্গের সাত-সাতটি বিধানসভায় খাতাই খুলতে পারল না তৃণমূল কংগ্রেস। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে অনেক আগেই পৌঁছে গিয়েছিল অমোঘ এই সমাচার। সাধারণ মানুষের সমাবেশে এই দারুণ সংবাদটি পৌঁছে দিতে তিনি এক মুহূর্তও দেরি করেননি। এরপর একে-একে আসতে লাগল অবিশ্বাস্য সব সংবাদ। তৃণমূলনেত্রীর সাধের দুর্গ ভবানীপুরে শুভেন্দু অধিকারীর অবিরাম গোলাবর্ষণ, অবশেষে পনেরো হাজারের বেশি ভোটে সেই দুর্গ দখল আপামর বাঙ্গালিকে কার্যত বাকরুদ্ধ করে দেয়। তাহলে তো এটাই সত্যি যে এ পৃথিবীতে কেউই অজেয় নয়!

শুভেন্দুবাবুর দ্বিতীয় কেন্দ্র নন্দীগ্রামেও জয় নেমে এল হালকা হাওয়ার মতো। অথচ শোনা যায় নন্দীগ্রামের চ্যালেঞ্জটি গ্রহণ করতে কোনও বিশেষ প্রস্তুতিও নিতে চাননি পূর্ব মেদিনীপুরের ভূমিপুত্র, একদা তৃণমূলের ঘরের লোক শুভেন্দু অধিকারী। আসলে শুভেন্দু অধিকারী বা আজকের বিজেপির অন্য কোনও প্রভাবশালী নেতা নন, তাঁদের সকলের আড়ালে, ইতিহাসের এক দুরন্ত বাঁকের মুখে ঠায় দাঁড়িয়ে ছিলেন মহাশক্তিশালী এক নেতা, যাঁর নাম ভারতকেশরী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। হিন্দুপ্রধান ভারতবর্ষের প্রভাবশালী মুসলমান নেতৃত্ব, দিল্লির কংগ্রেস গভর্নমেন্ট, সবার উপরে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর শ্যামাপ্রসাদের প্রতি অকারণ অসূয়া, এদেশের তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে অনেক বেশি জটিল করে তুলেছিল। একদিকে কংগ্রেস, অন্যদিকে মুসলিম লিগ, এই দুই শক্তিমানের মোকাবিলায় অনেক ভেবেচিন্তে ভারতীয় জনসঙ্ঘ নামে এক তৃতীয় শক্তির জন্ম দিলেন ভারতকেশরী শ্যামাপ্রসাদ, পরবর্তীকালে যার নাম এবং পরিচিতি কিছুটা বদলে হয় ভারতীয় জনতা পার্টি বা বিজেপি। উত্তর ভারতের এক বিরাট অংশের দখল নেওয়ার পর ওড়িশা, অন্ধ্রপ্রদেশ-সহ দাক্ষিণাত্যের বেশ কিছু অঞ্চল, অসম, মেঘালয় ও ত্রিপুরায় শক্তপোক্ত সরকার গড়তে এখন মরিয়া ভারতীয় জনতা পার্টি। পশ্চিমবঙ্গে সরকার গড়ে ফেলার পর যাদের মুখে এখন একটাই স্লোগান— ডিটেক্ট, ডিলিট অ্যান্ড ডিপোর্ট।

বহুযুগের ওপার থেকে ভারতকেশরী শ্যামাপ্রসাদই যেন তাঁর সেই অতিচেনা বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলে যাচ্ছেন— ওঠো, জাগো, বলো, আসমুদ্র হিমাচলের প্রতিটি ভারতবাসী তোমার ভাই। কিন্তু লক্ষ্য রাখো, ছদ্মবেশ আর ছদ্ম পরিচয়ের আড়ালে কেউ যেন তোমার মুখের গ্রাস কেড়ে নেওয়ার দুঃসাহস না দেখায়। যদি কেউ তা দেখায়, তাকে তুলে দাও পুলিশের হাতে। বলো, রোহিঙ্গা নয়, বাংলাদেশি মুসলমান নয়, মায়ানমারের অনুপ্রবেশকারীও নয়। প্রকৃত ভারতবাসীই শুধু আমার ভাই। জওহরলাল নেহরুর সুপরিকল্পিত রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের প্লট বহু যুগ আগেকার কাশ্মীরে ফেলে রেখে শ্যামাপ্রসাদ আজ বেঁচে উঠেছেন নতুন চেহারায়।

তাঁকে আজ অমান্য করে কার সাধ্য?

ভারতের ক্রমবর্ধমান রপ্তানি নীতি এবং মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির গুরুত্ব

পূর্ব রায়চৌধুরী

'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী'— একথা আমরা চিরকালই শুনে আসছি, অর্থাৎ অর্থনৈতিক উন্নতি করতে গেলে ব্যবসাবাণিজ্য ছাড়া কোনো গতি নেই। সেটা পরিবার বা গোষ্ঠীতে হোক অথবা সার্বভৌম দেশের ক্ষেত্রে হোক। যখনই কোনও দু'টি দেশ বা দেশসমূহ নিজেদের মধ্যে বাণিজ্য করতে উদ্যোগী হয় তখনই দরকার পড়ে এক বাণিজ্য চুক্তির। এই চুক্তিতে লিপিবদ্ধ থাকে সকল প্রকার নির্দেশনামা ও করব্যবস্থা। বিগত সময়ে ভারতের রপ্তানি নীতি সর্বদা নির্দিষ্ট কিছু বাজারের ওপর নির্ভরশীল ছিল, যেখানে বাজার সম্প্রসারণের চেয়ে রপ্তানি বৃদ্ধির দিকেই বেশি মনোযোগ দেওয়া হতো। কিন্তু কোভিড মহামারীর সময় ভারত সরকারের নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি চিকিৎসা সরঞ্জাম, পিপিই কিট ও ভ্যাকসিন বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে রপ্তানি শুরু করে, যা রপ্তানির ক্ষেত্রে এক নবদিগন্ত উন্মোচন করে। রপ্তানির জন্য মাত্র এক বা দু'টি দেশের ওপর নির্ভর করা বুদ্ধিমানের কাজ নয় এবং কেন্দ্রীয় সরকার তা উপলব্ধি করেছে। তাই ভবিষ্যতে অন্য কোনো দেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক বৈরিতা তৈরি হলেও যাতে ক্ষতি না হয় তার জন্য সরকার আগে থেকেই পরিকল্পনা শুরু করেছে। যেহেতু কোভিড চলাকালীন ভারতের উৎপাদিত পণ্যের গুণমান এবং সাশ্রয়ী মূল্যের কারণে বিশ্বজুড়ে তা সমাদৃত হয়েছিল, তাই সরকার ব্যবসায়ীদের উৎপাদন বৃদ্ধিতে উৎসাহিত করতে 'মেক ইন ইন্ডিয়া' এবং উৎপাদন-ভিত্তিক বিভিন্ন ইনসেন্টিভ কর্মসূচি চালু করে।

প্রতিটি দেশই পর্যাপ্ত পরিমাণ রপ্তানির মাধ্যমে তাদের বাণিজ্যিক ভারসাম্য বজায় রাখতে চায়। এর জন্য দেশগুলো বিভিন্ন বাণিজ্যিক চুক্তি স্বাক্ষর করে, যেখানে শুল্কের হার নির্ধারণ করা হয়। সাধারণত নির্দিষ্ট কিছু অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত শিল্প ও কৃষি ক্ষেত্রকে সুরক্ষা দিতেই এই শুল্ক আরোপ করা হয়। তবে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশগুলো শুল্কমুক্ত বাণিজ্যিক চুক্তির দিকে অগ্রসর হয়, যাতে কম খরচে পণ্য ও পরিষেবা আদান-প্রদান করা যায়— অর্থনীতির পরিভাষায় একে 'মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি' বলা হয়।

সাম্প্রতিক সময়ে ভারত সরকারের সফল হওয়া বেশ কিছু মুক্ত-বাণিজ্য চুক্তি আমাদের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের জন্য স্বস্তি নিয়ে এসেছে। আমেরিকার উচ্চ শুল্ক নীতির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া রপ্তানি-নির্ভর ক্ষেত্রগুলো এই নতুন চুক্তির ফলে আবার ঘুরে দাঁড়াচ্ছে। বিশেষ করে, ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU)-এর সঙ্গে হওয়া ঐতিহাসিক চুক্তিটি ভারতকে চামড়া, তথ্যপ্রযুক্তি, মৎস্য এবং কৃষি পণ্যের বাজারে অবাধ প্রবেশাধিকার দিয়েছে। এই মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিগুলো সম্পাদনের মাধ্যমে ভারত মূলত তার রপ্তানি ক্ষেত্রকে 'বিপন্মুক্ত' করছে। যখন আমেরিকা টেক্সটাইল বা চামড়ার মতো প্রথাগত খাতগুলিতে উচ্চ শুল্ক আরোপ করে, তখন ইউরোপীয় ইউনিয়ন বা ব্রিটেনের মতো ঐতিহাসিক বিকল্প বাজারগুলো ভারতের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের জন্য সুরক্ষা কবচ হিসেবে কাজ করে। সর্বশেষ অর্থনৈতিক ও শ্রমশক্তি সমীক্ষা অনুযায়ী, ভারতের মোট ৫৬.২ কোটি কর্মশক্তির প্রায় ৫১-৫২ শতাংশ কৃষি, তথ্যপ্রযুক্তি, মৎস্য পণ্য, পোশাক ও চামড়া শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। এই ক্ষেত্রগুলো জিডিপি (GDP) এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে প্রধান ভূমিকা পালন করে। তাই এই ক্ষেত্রগুলোকে রক্ষা করা ভারত সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার এবং তারা অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে তা বাস্তবায়ন করছে।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও ব্রিটেন ছাড়াও ভারত সরকার নিউজিল্যান্ড, ইজরায়েল, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি (UAE) এবং অন্যান্য উপসাগরীয় দেশগুলোর সঙ্গে নতুন মুক্তবাণিজ্য চুক্তির জন্য নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। এই চুক্তির মূল লক্ষ্য হলো নাগরিকদের জীবনযাত্রার মান এবং ব্যবসার উন্নতি ঘটানো। চামড়া, মৎস্য, পোশাক ও কৃষি— এই প্রতিটি খাতে বিপুল সংখ্যক মহিলাকর্মী নিয়োজিত রয়েছেন, যা গ্রামীণ ভারতের জীবিকার প্রধান উৎস। গ্রামীণ মহিলারা সরাসরি চাষাবাদ থেকে শুরু করে ধানের জমিতে কাজ করা পর্যন্ত বিভিন্নভাবে এর সঙ্গে যুক্ত। এমনকী পোশাক শিল্পে প্রায় ৬০-৭০ শতাংশ কর্মীই মহিলা। তাই এই ক্ষেত্রগুলোকে মুক্ত বাণিজ্যের মাধ্যমে উৎসাহিত করার অর্থ হলো পরোক্ষভাবে 'নারী ক্ষমতায়ন'কেও ত্বরান্বিত করা। □

ফলতায় পুনর্নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের জামানত বাজেয়াপ্ত

ফলতার পুনর্নির্বাচনের ফল ঘোষণায় দেখা গেল। তৃণমূলের প্রার্থী জাহাঙ্গির খান ভোট পেয়েছে ৭,৭৮৩টি। এখানে তৃণমূল কংগ্রেস চতুর্থ স্থানে আছে, বিজেপির দেবাংশু পাণ্ডা বিপুল ভোটে জয়লাভ করেছে। বিজেপি জয়লাভ করেছে ১,৪৯, ৬৬৬ ভোটে। তৃণমূলের শোচনীয় পরাজয়। জনগণ কী পরিমাণ তৃণমূল কংগ্রেসকে ঘৃণা করে তার প্রতিফলন ঘটেছে এই নির্বাচনে। এখানে ৭০ শতাংশ হিন্দু জেগে উঠেছে, নির্ভয়ে তারা ভোট দিতে পেরেছে। জনগণ গণতন্ত্রের কণ্ঠস্বর। তারা গণতন্ত্রের ধারক বাহক। তারা গণতন্ত্রের সত্যিকারের পূজারি, তাই তারা সরকার ফেলে সরকার গড়ে। অন্যদিকে নেতা-নেত্রীরা গণতন্ত্রের ব্যবহার করে। তারা জনগণের ভাষা বুঝতে পারে না। ক্ষমতার লোভে দিশাহারা হয়। অহংকারী দাম্ভিক হয়ে ওঠে। তৃণমূল নেতা-নেত্রীদের মধ্যে তা দেখা গিয়েছে। তারা মানুষকে মানুষ ভাবতে পারত না। তাদের শাসনে সরকারি কর্মচারীদের কুকুর বানিয়ে ছিল। মুসলমানদের দুধেল গাই বানিয়ে দিয়েছিল আর নিজেদেরকে সম্রাট ভাবতে শুরু করেছিল। অবশেষে গণতন্ত্রের জয় হলো। ফলতাবাসীরা মুক্তির স্বাদ পেলো।

—**সুবল সরদার,**
মগরাহাট, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রবাদী সরকারের সামনে প্রত্যাশার পাহাড়

দীর্ঘ রাজনৈতিক টানাপোড়েন, মতাদর্শগত সংঘাত এবং সাংস্কৃতিক বিতর্কের পর পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক চিত্রে এসেছে বড়ো পরিবর্তন। হিন্দু সমাজের বৃহত্তর ঐক্য ও জাতীয়তাবাদী ভাবধারার উপর ভর করে রাজ্যের ক্ষমতায় এসেছে নতুন রাষ্ট্রবাদী সরকার। বহু মানুষের কাছে এই ফলাফল শুধুমাত্র সরকার পরিবর্তন নয়, বরং এক মানসিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিক্রিয়ার বহিঃপ্রকাশ।

সমাজের একাংশের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা, সংস্কৃতি, ইতিহাসচর্চা এবং রাজনৈতিক চিন্তাধারার উপর এক বিশেষ মতাদর্শের প্রভাব বিস্তার করা হয়েছিল। ভারতীয় ঐতিহ্য, আধ্যাত্মিকতা ও জাতীয় চেতনাকে দুর্বল করার চেষ্টা হয়েছিল বলেও মত প্রকাশ করেছেন অনেকে। সেই অসন্তোষ থেকেই সাধারণ মানুষের এক বড়ো অংশ পরিবর্তনের পক্ষে নিজেদের মত স্পষ্ট করেছে।

পশ্চিমবঙ্গের মানুষ এখন নতুন সরকারের দিকে তাকিয়ে রয়েছে আশার চোখে। কারণ শুধুমাত্র রাজনৈতিক বক্তব্য নয়, বাস্তব জীবনের সমস্যার সমাধানই এখন সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ। বেকারত্ব, শিল্পের অভাব, দুর্নীতি, সীমান্ত সমস্যা, শিক্ষা ব্যবস্থার অবনতি এবং আইনশৃঙ্খলার প্রশ্নে দীর্ঘদিনের ক্ষোভ থেকেই মানুষ পরিবর্তনের পক্ষে রায় দিয়েছে। বিশ্লেষকদের মতে, নতুন সরকারের সবচেয়ে বড়ো দায়িত্ব হবে উন্নয়ন ও সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয়ের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা। জনগণ চায় এমন এক প্রশাসন, যেখানে স্বচ্ছতা থাকবে, যোগ্যতার মর্যাদা থাকবে এবং সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা ও সম্মান নিশ্চিত হবে। একই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের ঐতিহ্য এবং ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাবোধও প্রশাসনিক নীতিতে প্রতিফলিত হোক— এই প্রত্যাশাও বাড়ছে। তবে রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জনের থেকেও কঠিন কাজ হলো মানুষের বিশ্বাস ধরে রাখা। আবেগের জোয়ারে ক্ষমতায় আসা সম্ভব হলেও, সেই আবেগকে দীর্ঘস্থায়ী করতে প্রয়োজন কার্যকরী প্রশাসন ও দৃশ্যমান উন্নয়ন। তাই নতুন রাষ্ট্রবাদী সরকারের সামনে এখন সবচেয়ে বড়ো পরীক্ষা— তারা কত দ্রুত সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবে রূপ দিতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাসে এই পরিবর্তন এক নতুন বার্তা দিয়েছে। এখন গোটা রাজ্যের নজর নবনির্বাচিত সরকারের দিকে। কারণ মানুষ পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখেছে, আর সেই স্বপ্ন পূরণের দায়িত্ব এখন সম্পূর্ণভাবে সরকারের কাঁধে।

—**কুন্তল চক্রবর্তী,**
কলেজ রোড, খয়রামারী, বনগাঁ, উ: ২৪ পরগনা।

গোরু সমস্ত স্তন্যপায়ী প্রাণীর মা

হিন্দু সংস্কৃতিতে উপকারী জীবকে হত্যা করা নিষিদ্ধ। পাঁঠা যেহেতু ভূমির ক্ষতি করে, তাই কোনো সময়, পরিবেশ রক্ষার্থে কম কষ্টে পাঁঠা বলি চালু হয়। কোনো স্ত্রী প্রাণীকে হত্যার অধিকার নেই হিন্দু ধর্মে বা ভারতে। সব স্ত্রী-প্রাণী মাতৃ সমতুল্য। এসব বুঝতে গেলে সহানুভূতির দরকার হয়, যা মরুভূমির কষ্টের পরিবেশে বাস করা আরবদের নেই। আরবদের থেকেই বিশ্বের মুসলমানরা তাদের মজহবি নীতি শিখেছে। হিন্দুধর্মে সব প্রাণীকে নিজের মতো করে বাঁচতে দেবার কথা বলা আছে। তাই চীনাদের মতো ভারত থেকে কোনো করোনা মহামারী সৃষ্টি হয় না। ইবোলা বা অন্য জীবাণুঘটিত মহামারী সৃষ্টি হয় না। গোরুর দুধ খেয়ে মানুষ বা যেকোনো প্রাণী বেঁচে থাকতে পারে। গোরুর গর্ভ ধারণ সময় মানুষের মতো।

হিন্দুরা প্রকৃতিকে পর্যবেক্ষণ করে, গবেষণা করে, হাজার হাজার বছরের অভিজ্ঞতা জ্ঞান অর্জন করেছে। ধর্মই হিন্দুদের ধারণ করে রেখেছে। হিন্দু ধর্ম জড় নয়, পরিবর্তনশীল, যুগানুকূল। তাই যুগে যুগে নতুন সংহিতা আসে। হিন্দু ধর্ম বাস্তুতন্ত্র টিকিয়ে রাখার পথ দেখিয়ে গেছে জীবনচর্যার মাধ্যমে। তাই হিন্দুরা সাপকেও মারে না। অন্য এক ধর্মে কুকুর ঘৃণ্য ও বধ্য প্রাণী। অথচ প্রাণীদের মধ্যে কুকুর ও গোরুর সব চেয়ে বেশি সহানুভূতিপ্রবণ এবং এরা সব চেয়ে বেশি বিশ্বাসী।

ফ ঃ ৩

পশ্চিমি দেশে আইনানুযায়ী পশু পাখিকে অবশ না করে, কষ্ট দিয়ে হত্যা করা হয়। হিন্দুরা তা করে না? বৈষ্ণবরা কোনো প্রাণী বলি না দিয়ে ফল বলি দেয়। কোনো প্রাণী হত্যায় পুণ্য হতে পারে না? ভগবানের সৃষ্টি কোনো জীবকে হত্যা করার অধিকার মানুষের থাকা উচিত নয়। যখন বিকল্প খাবার থাকে তখন প্রাণী হত্যার কী প্রয়োজন? ফুড পয়জন, সারমোনেলা জীবাণু কিন্তু মাংসজাতীয় খাবার থেকেই হয়।

পশ্চিমিরা আজকাল নিরামিষের দিকে ঝুঁকছে। বিশ্বের ৭০ শতাংশ শস্য যায় চাষের পশুপাখির পেটে। নির্বিচারে জঙ্গল সাফ করার ফলে জলবায়ুর পরিবর্তন হচ্ছে।

এখন ল্যাবে যে কোনো প্রাণীর টিস্যু দিয়ে সেই প্রাণীর মাংস উৎপাদন হচ্ছে। এরপর মাংস খেতে পশুপাখি চাষ করতে হবে না। তবু নির্বিচারে গোহত্যা চলছে। এর সমাধান খোঁজা দরকার।

প্রত্যেকের ধর্ম আলাদা। ধর্ম হলো একটি নীতি। যা কোনো জীব প্রাণী বা মানুষকে ধারণ করে রাখে। পরিবেশকে বাঁচাতে ধর্ম অনুযায়ী জীবনধারণ প্রয়োজন। কিন্তু অনেক ধর্ম পরিবেশ বিরোধী।

নিজে বেঁচে থাকতে ও প্রকৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে চাইলে হিন্দু ধর্ম আচরণ করা উচিত। বিজ্ঞানমনস্ক, দার্শনিক ও জ্ঞানী না হলে হিন্দু ধর্ম বোঝা যায় না।

—মৃণাল মজুমদার,
বার্লিন, জার্মানি।

তফাত শুধুই কি শিরদাঁড়ায়?

এই তো সেদিন মঞ্চে যাদের
দাপট ছিল দেখার মতো
গিরগিটি এই লেখক, তাদের
সুর বদলও শেখার মতো।

ছিল অনেক বড়ো মাপের
ক্ষমতাবান, রাজার কবি
সভাসদ, তাই মেজাজ দাপের
আজকে তাদের অন্য ছবি।

হাত জোড়ে সে ঠিকই দাঁড়ায়
নতুন রাজার পায়ের কাছে
তফাত শুধুই কি শিরদাঁড়ায়
নাকি, অন্য কোনো গল্প আছে?

—অশোক কুমার ঠাকুর,
কোচবিহার।

তৃণমূল সরকারের শাসনকালে তৃণমূল আশ্রিত গুন্ডারাজের প্রকৃষ্ট উদাহরণ

পুরাতন মালদহের নারায়ণপুরে অবস্থিত কেন্দ্র সরকারের অধীন ইন্ডিয়ান ওয়েল কর্পোরেশনের গ্যাস বটলিং প্ল্যান্টে কর্মরত ৮৫ জন গরিব শ্রমিকের উপর মধ্যযুগীয় বর্বরতার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করে অত্যাচার চালিয়ে শ্রমিকদের সার্বিক মজুরি না দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়া হয় এবং এর প্রতিবাদ যেই করবে তাকে মেরে প্ল্যান্ট থেকে বের করে দেওয়া হয়। ২০-২২ বছর ধরে কর্মরত শ্রমিকদেরও বের করে দেওয়ার নজির রয়েছে। আরও বলা যেতে পারে, স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বও টিএমসি গুন্ডাদের বিরুদ্ধে কোনো কথা না বলে সেটা রফার মাধ্যমে মিটিয়ে নেয়। বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যই এই পত্রের অবতারণা। শ্রমিকদের সঙ্গে কীরকম অমানবিক ব্যবহার করা হয় তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হলো।

১. নিয়োগ পত্র ছাড়াই কন্ট্রাক্টর শ্রমিকদেরকে কাজে লাগায়।

২. শ্রমিকদের নির্দিষ্ট কোনো টাকা ধার্য নেই। ইচ্ছামতো যা খুশি তাই দেওয়া হয়।

৩. কন্ট্রাক্টর শ্রমিকদেরকে IOCI-এর কোনো রকম কোনো সুযোগ সুবিধা দেয় না। যেমন অ্যাক্সিডেন্ট বেনিফিট, ট্রাভেলিং অ্যালাউন্স আরও বিভিন্ন রকম অ্যালাউন্স দেয় না।

৪. কন্ট্রাক্টর শ্রমিকদের বার্ষিক বোনাস নির্দিষ্ট কোনো শতাংশ অনুপাতে দেয় না। যাকে যা খুশি তাই দিয়ে দেয়।

৫. বার্ষিক পাওনা ছুটি দেয় না, বার্ষিক মেডিক্যাল লিভ দেয় না, হলিডে লিভও দেয় না।

৬. শ্রমিকদের নিরাপত্তার ব্যাপারে কন্ট্রাক্টর ও IOCL কর্তৃপক্ষ কোনোরকম খেয়াল রাখে না। যেমন সেফটি সু, হেলমেট, রেনকোর্ট, ইউনিফর্ম, ২ কেজি ডিটারজেন, ২ কেজি গুড়, ৫ গ্রাম নারকেল তেল কোনো কিছুই শ্রমিকদেরকে দেওয়া হয় না।

৭. বিনা পে-স্লিপে শ্রমিকদের বেতন দেওয়া হয়।

৮. অধিকাংশ শ্রমিকদের EPFO, ESIC, অ্যাকাউন্ট খুলে দেওয়া হয় না। কর্মরত বহু পুরনো শ্রমিকের EPFO ও ESIC রানিং অ্যাকাউন্ট মৃত দেখিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়।

৯. মাসের নির্দিষ্ট কোনো তারিখে বেতন দেওয়া হয় না। ২-৩ মাস অন্তর বেতন দেওয়া হয়। এমন শ্রমিকও আছেন যারা কন্ট্রাক্টরের কাছে ১-২ বছরের কাজের টাকাও পাবেন।

১০. কন্ট্রাক্টর শ্রমিকদের কোনো মাসেই একসঙ্গে সম্পূর্ণ বেতন দেয় না দুই বা তিনবারে দেয়।

১১. ওভার টাইমের পয়সা কন্ট্রাক্টর শ্রমিকদেরকে দেয় না।

১২. ৬ মাস পর পর সরকারি নিয়ম অনুসারে যেমন ডিএ বাড়ে সেই ডিএ-এর বাড়তি টাকাও কন্ট্রাক্টর শ্রমিকদেরকে দেয় না।

১৩. কন্ট্রাক্টর শ্রমিকদের ওয়েজ রেজিস্টারে দিন উল্লেখ না করে ব্ল্যাঙ্ক খাতায় সই করায়— কেউ মাসে ২৬ দিন কাজ করলে ১০ দিন দেখায়। ২০ দিন করলে ৮ দিন দেখায়। কন্ট্রাক্টর নিজের ইচ্ছামতো ভুয়ো রেজিস্টার বানিয়ে রেখেছে।

—নিপীড়িত শ্রমিকদের পক্ষে
অসীম চৌধুরী
গ্যাস বটলিং প্ল্যান্ট, নারায়ণপুর,
মালদহ
ফোন নং : ৯১২৬৪০১৩০১

জীবনচর্যাজনিত অসুখে নারী

প্রীতি বসু

প্রত্যন্ত গ্রামের গৃহকর্ত্রী ছিয়ানব্বই বছরের বৃদ্ধা ত্রিনয়নীদেবী দেখলেন তাঁর তিপান্ন বছরের জ্যেষ্ঠা কন্যা শেফালী শহর থেকে মোটরগাড়ি করে পিতৃগৃহে এসেছে। তাঁর স্থূলকায় মেয়ে ঘেমে-নেয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে কোনো মতে গাড়ি থেকে নেমেছে। ত্রিনয়নীদেবী তরতরিয়ে হেঁটে এসে মেয়ের হাত ধরে নিয়ে চললেন। মেয়ের কষ্টে হৃদয়ে আঘাত পেলেও হেসে হেসে বললেন— 'আমরা তো সেকেলে মা, তোমরা আজকের দিনের মেয়েরা আধুনিক হতে হতে শরীরটাকেই যে নষ্ট করে ফেললে। সেবার জামাই-বাবাজী এসেছিল, তার শরীরের হালও তো দেখলাম তোমার মতোই। নাতি-নাতনি দুটো এসেছিল— তাদের শরীরের হালও তো তোমাদের মতোই হয়ে উঠছে।'

সমীক্ষার ফলাফলে দেখা গেছে উপরোক্ত বর্ণনাই সেকেলে ও আধুনিক জীবনযাত্রার পদ্ধতিগত পরিবর্তনের ফলাফল।

খুব ভালোভাবেই মনে আছে স্বাস্থ্য সম্পর্কে বইয়ের প্রথম পাতার প্রথম পঙ্‌ক্তিতেই লেখা ছিল— 'স্বাস্থ্যই সম্পদ'। এই কথাটি চিরায়ত সত্য। স্বাস্থ্য ভালো না থাকলে মানুষ সুস্থ থাকতে পারে না। মানুষের স্বাস্থ্যের দু'টি দিক হলো— একটি শারীরিক ও অপরটি মানসিক। এই শরীর ও মনের সুস্বাস্থ্যই একটি মানুষকে রাখে সজীব, প্রাণবন্ত, কর্মচঞ্চল, সুদক্ষ ও সুন্দর।

উপরোক্ত বর্ণনায় দেখা গেছে— তিনটি প্রজন্মের— মা, মেয়ে ও নাতনি— তিনজন নারীর মধ্যে মা সুস্বাস্থ্যের অধিকারিণী, কিন্তু মেয়ে ও নাতনি স্বাস্থ্যের অবনতিতে নানান শারীরিক অসুবিধাতে আক্রান্ত।

সেকালের মহিলারা ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠে সারাদিন ধরেই ঘর-গৃহস্থালির নানান কাজকর্ম সেরে কাটিয়ে দিতেন। কায়িক পরিশ্রম তাঁদের যথেষ্টই করতে হতো। তার মধ্যেও পরস্পর গল্পগুজব করে বা সময়ে পূজা, খেলা বা সিনেমা-থিয়েটার দেখে আনন্দ উপভোগ করতেন। শিশুকন্যারা লেখাপড়াও করতো আবার মুক্ত আনন্দে খেলাধুলোও করতো। অতি চাপে জর্জরিত ছিল না।

কালের নিয়মে জীবনযাত্রায় পরিবর্তন এসেছে। গ্রাম্যজীবনের শান্তস্নিগ্ধ পরিবেশ রাজনীতি-সহ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কৃত ভোগ্যপণ্যের আঁচে পড়ে বদলে যাচ্ছে। আধুনিক বিজ্ঞান তার প্রযুক্তিজাল সর্বত্রই ছড়িয়ে দিয়েছে। এটি আগে ছিল শুধুমাত্র শহরেই, কিন্তু আজ গ্রামেও টিভি, ফ্রিজ, মোবাইল প্রভৃতি ভোগ্যপণ্যের স্রোত ঢুকে পড়েছে। ফলে মানুষের জীবন আয় বাড়ানোর নেশায় ব্যস্ত থেকে ব্যস্ততম হয়ে পড়েছে। এককথায় মানুষও যন্ত্র হয়ে যাচ্ছে।

যান্ত্রিক সভ্যতা ও ভোগবাদী জীবন এখন এগিয়ে চলেছে আরও উন্নতি, আরও উন্নতি, আরও আরামের উৎস সন্ধানে। আত্মসুখের নেশায় বিভোর মানুষের পক্ষে এখন আর বেশি সময় নিয়ে আত্মিক সম্পর্ক নির্মাণ, হৃদয়ের মিলন, প্রেমপ্রীতির বন্ধনে আটকে থাকা বা আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে সময় যাপনের অবকাশ পাওয়া একেবারেই অসম্ভব হয়ে উঠছে। যার ফলে পিতা-মাতা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে সম্পর্কের সেতু ক্রমশই আলগা হয়ে পড়ছে। শ্রমশক্তি, মেধা বেহিসেবি ভাবে খরচ করে চলেছে। মদ, হেরোইন, গুটখা প্রভৃতি নানান বিপজ্জনক নেশায় আক্রান্ত হচ্ছে। অপুষ্টিকর সার ও বিষে জর্জরিত খাদ্যশস্য খেয়ে মানুষের স্বাস্থ্য ক্রমবর্ধমান হারে বিপন্ন। মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে 'জীবনচর্যাজনিত' (Life Style Diseases) অসুখে, যথা— স্থূলত্ব, উচ্চ রক্তচাপ, সুগার, হার্টের অসুখ, এইচআইভি সংক্রমণ প্রভৃতি।

মহিলারাও আজ পুরুষের সঙ্গে সকলকাজেই সমানভাবে এগিয়ে চলেছেন। কিন্তু তাঁদের দৈহিক গঠনের জন্য অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে গিয়ে তাঁরা 'লাইফ-স্টাইল-ডিজিজ'-এ ভীষণভাবেই আক্রান্ত হচ্ছেন। বিশেষভাবে মাতৃত্বকালীন নানান অসুবিধা তাঁদের ঘিরে ধরেছে।

মনে হয় নারীরা একটু সচেতন হলে 'লাইফ-স্টাইল-ডিজিজ'— থেকে দূরে থাকতে পারবেন। এজন্য তাঁদের প্রয়োজন মানসিক দৃঢ়তা, খাদ্যাভ্যাসে সংযম, অহেতুক মানসিক জটিলতা সৃষ্টি হতে না দেওয়া, মানবিক সম্পর্কে যত্নশীল থাকা, সর্বোপরি সংযমী আচার-আচরণ পালন করা। □

মাইগ্রেন চিকিৎসায় হোমিওপ্যাথির ভূমিকা

ডাঃ বলরাম পাল

মাইগ্রেন শব্দের উৎপত্তি হয়েছে গ্রিক শব্দ মেমিক্রানিয়া থেকে, (হেমি অর্থাৎ অর্ধেক এবং ক্রানিয়ন শব্দের অর্থ খুলি। যার অর্থ মাথার একদিকে ব্যথা বা one sided headache। বাংলা ভাষায় এর একটি সুন্দর প্রতিশব্দ আছে যা হলো 'আধ কপালি'। যদিও মাথার একদিকে ব্যথা বলা হয়, কিন্তু মাথার দুদিকেও এই ব্যথা হতে পারে। মাইগ্রেনে শুধুমাত্র মাথা ব্যথাই হয় না তার সঙ্গে কিছু স্নায়বিক, যেমন আলো বা শব্দের একটা প্রভাব থাকে। যাদের মাইগ্রেন হবার প্রবণতা আছে, তাদের শব্দ, আলো, গন্ধ, বাতাসের চাপের তারতম্য এবং কিছু বিশেষ ধরনের খাবারের প্রভাবেও মাথাব্যথা শুরু হতে পারে। আবার কোনো কোনো বিশেষজ্ঞের মতে মাথাব্যথা নেই অথচ কিছু কিছু উপসর্গ লক্ষ্য করা যায় যাকে মাইগ্রেন বলা যেতে পারে। মোটকথা, মাইগ্রেন একধরনের স্নায়বিক ব্যাধি। কারণ এই সমস্যা মস্তিষ্কে সৃষ্টি হয় এবং তারপর ধীরে ধীরে রক্তশিরায় ছড়িয়ে যায়।

লক্ষণাবলীর বিভিন্ন পর্যায় :

১. প্রারম্ভিক পর্যায় :

- মাথাব্যথা শুরু হওয়ার কয়েক ঘণ্টা থেকে কয়েক দিন আগে মেজাজের পরিবর্তন ঘটে যেমন খিটখিটে মেজাজ, বিরক্তি, বিষণ্ণতা বা অতিরিক্ত উচ্ছ্বাস ইত্যাদি।
- খাবারের প্রতি তীব্র আকাঙ্ক্ষা বা অনাকাঙ্ক্ষা এবং অস্বাভাবিক পিপাসা থাকতে পারে।
- কোষ্ঠকাঠিন্য।
- ঘাড় শক্ত হয়ে যাওয়া এবং ঘন ঘন হাই তোলা।

২. স্নায়বিক পর্যায় :

এই পর্যায়টি সাধারণত মাথাব্যথার ঠিক আগে বা মাথাব্যথা চলাকালীন ঘটে এবং ৫ মিনিট থেকে ১ ঘণ্টা স্থায়ী হয়।

- এ সময় মনে হয় যেন আলোর রশ্মি চোখ ঝলসে দিচ্ছে।
- মুখ, হাত, পায়ে ঝিনঝিন করা বা সুচ ফোটানোর মতো অনুভূতি হয়।
- কথা বলার সময় খেই হারিয়ে যায়, ফলে স্পষ্টভাবে কথা বলতে সমস্যা হয়।

৩. মাথাব্যথার পর্যায় :

এই মাথাব্যথার পর্যায়ে যদি সঠিক চিকিৎসা না হয় তবে তা ৪ ঘণ্টা থেকে ৭২ ঘণ্টা পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে।

- এই পর্যায়ে ভীষণ মাথা দপদপ করে এবং একটা স্পন্দন বা কম্পন অনুভূত হয়।
- ব্যথা মাথার একপাশে, যা ডান দিক বা বাম দিক যে কোনো দিকে হতে পারে। আবার দুদিকেও হতে পারে।
- সিঁড়ি বেয়ে ওঠা নামা বা হাঁটাহাঁটি করলেও মাথাব্যথা বেড়ে যায়।
- এ সময় রোগী আলো এবং শব্দের প্রতি ভীষণ সংবেদনশীল হয়ে পরে। ফলত রোগী বলতে থাকে ঘরের আলো বন্ধ করে দাও, জানলা দরজা বন্ধ করে দাও, যাতে বাইরে থেকে আলো এবং শব্দ না আসে।
- এ সময় বমি বমি ভাব এবং বমি হওয়া একটি সাধারণ লক্ষণ। তবে এ-ও লক্ষ্য করা যায় বমি হয়ে যাওয়ার পর মাথাব্যথা কিছুটা উপশম হয়।

৪. অন্তিম পর্যায় :

সাময়িক মাথাব্যথা কমে যাওয়ার পর রোগী বেশ কিছুদিন বা কিছু সময় সুস্থ অনুভব করে এই পর্যায়টাকে migraine hangover বলা হয়।

- এই পর্যায়ে একটা ক্লান্তি, অবসাদ বা দুর্বলতা অনুভব হয়।
- কোনো বিষয়ে মনোযোগ দিতে অসুবিধা হতে পারে।
- হালকা মাথা ভার হয়ে থাকে।

চিকিৎসা :

যদি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ব্যবস্থায় নির্দিষ্ট করে কোনো ওষুধের নাম বলা যায় না ঠিকই, তবে কয়েকটি কার্যকরী ওষুধের নাম এখানে উল্লেখ করা যেতেই পারে যেমন— বেলাডোনা, ব্রায়োনিয়া, জেলসেমিয়াম, গ্লোনইনাম, আইরিস ভার্স, ন্যাট্রাম মিউর, স্যাঙ্গুইনারিয়া ক্যান, স্পাইজেলিয়া ইত্যাদি।

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ব্যবস্থায় বলা হয় 'we treat the patient not the disease'। সুতরাং হোমিওপ্যাথিতে মাইগ্রেনের চিকিৎসা করতে গেলে রোগীর রোগ, লক্ষণ, সমষ্টি পর্যালোচনা করে, রোগের কারণ নির্ণয় করে, শারীরিক ও মানসিক স্থিতি ইত্যাদি বিবেচনা করে ওষুধ নির্বাচন করতে হবে। ওষুধ নির্বাচন করলেই হলো না, ওষুধের শক্তি ও মাত্রা নির্ণয় করতে হবে। তাই এই রোগ চিকিৎসার জন্য অভিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন। ◻

ক্ষত্রিয় সমিতির উদ্যোগে নবনির্বাচিত বিধায়কদের সংবর্ধনা

মালদহ জেলার ক্ষত্রিয় সমিতির উদ্যোগে গত ২২ মে পুরাতন মালদার বিদ্যা ভারতী শিশুতীর্থে জেলার ভারতীয় জনতা পার্টির ৬ জন নবনির্বাচিত বিধায়ককে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। এই মহতী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ক্ষত্রিয় কেন্দ্রীয় সমিতির সভাপতি ভবানীচরণ সিংহ, কেন্দ্রীয় সমিতির পর্যবেক্ষক সৌমেন রায়, কেন্দ্রীয় সহ সম্পাদক দীপঙ্কর কমল বর্মন, কেন্দ্রীয় সদস্য তপন সরকার, মালদা জেলা সভাপতি পরেশ চন্দ্র সরকার, জেলা সম্পাদক ভূপেশ বর্মন এবং ঠাকুর পঞ্চানন বিষয়ক গবেষক ও বহু গ্রন্থের রচয়িতা ননীগোপাল রায়। এছাড়াও বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ ফণীভূষণ রায় ও ডাঃ বিজয় ঘোষ উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত অতিথিরা প্রদীপ প্রজ্বলন ও ঠাকুর পঞ্চাননের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করে বিদ্যা ভারতী শিশুতীর্থের বোনেরা। প্রাস্তাবিক ভাষণ দেন ক্ষত্রিয় সমিতির জেলা সম্পাদক ভূপেশ বর্মন। তারপর শুরু হয় বিধায়কদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন। গাজোলের বিধায়ক চিন্ময় দেববর্মনকে পরেশ চন্দ্র সরকার, পুরাতন মালদহের বিধায়ক গোপাল সাহাকে বিদ্যা ভারতী শিশুতীর্থের কর্ণধার দশরথ বর্মন, ইংলিশ বাজারের বিধায়ক অম্লান ভাদুড়ীকে দীপঙ্কর বর্মন, হবিবপুরের বিধায়ক জুয়েল মুর্মুকে ভূপেশ বর্মন, বৈষ্ণবনগরের বিধায়ক রাজু কর্মকারকে তপন সরকার এবং মানিকচকের বিধায়ক গৌরচন্দ্র সাহাকে উত্তরীয় ও পুষ্পস্তবক দিয়ে সম্মানিত করেন সৌমিক বর্মন। ক্ষত্রিয় সমিতির ধ্যেয়গীত পরিবেশন করেন পরেশ চন্দ্র সরকার। বক্তব্য রাখেন ননীগোপাল রায়। তারপর ভবানীচরণ সিংহ ক্ষত্রিয় সমিতির ৪টি দাবি বিধায়কদের মাধ্যমে রাজ্য সরকারের কাছে তুলে ধরেন— এক, রাজবংশী ভাষাকে দেশের অষ্টম তালিকাভুক্ত করা। দুই, কলকাতায় ঠাকুর পঞ্চাননের পূর্ণাবয়ব মূর্তি স্থাপন। তিন, পাঠ্যপুস্তকে ঠাকুর পঞ্চাননের জীবনী অন্তর্ভুক্ত করা এবং চার, ঠাকুর পঞ্চাননের জন্মদিন শুধু ছুটি ঘোষণা নয়, অবশ্য পালনীয় হিসেবে তালিকাভুক্ত করা। এরপর ৬ জন বিধায়ক একে একে বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন দীপঙ্কর কমল বর্মা এবং ধন্যবাদ জানান সমিতির জেলা সহ সম্পাদক সৌমিক বর্মন। শান্তিমন্ত্র পাঠের পর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থার প্রতিবাদে সত্যাগ্রহ করে যাঁরা কারাবরণ করেছিলেন, তাঁরা গত ২৫ মে হাওড়া জগাছায় সত্যাগ্রহী ডাঃ শম্ভুনাথ ধারার বাড়িতে একত্রিত হন। উপস্থিত ছিলেন প্রতাপ বন্দ্যোপাধ্যায়, দিনেশ পেরিয়াল, বিদ্যাসাগর মন্ত্রী, চিত্তরঞ্জন দে, অশোক মণ্ডল, স্বপন মান্না, কিরণশঙ্কর বর্মা, ওমপ্রকাশ রাউত ও ডাঃ শম্ভুনাথ ধারা।

প্রেস ক্লাবে নেতাজীপ্রেমীদের সাংবাদিক সম্মেলন

গত ২২ মে কলকাতা প্রেস ক্লাবে নেতাজীপ্রেমীদের উদ্যোগে আয়োজিত হয় একটি সাংবাদিক সম্মেলন। 'নেতাজী তদন্ত প্রসঙ্গে তাইওয়ান সরকারের সাম্প্রতিক জবাব'-শীর্ষক সাংবাদিক সম্মেলনটির আয়োজক ছিলেন সাংবাদিক বিটু রায়চৌধুরী এবং বিশিষ্ট লেখক সৌম্যব্রত দাশগুপ্ত ও সৈকত নিয়োগী। এদিনের সম্মেলনের আয়োজকদের পক্ষ থেকে নবনির্বাচিত পশ্চিমবঙ্গ

সরকারের উদ্যোগে বিভিন্ন সামাজিক ক্ষেত্রে যে উন্নয়নযজ্ঞের সূচনা হয়েছে, সেই জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। তাঁরা জানান যে, ১৯৫৬ সালে তাইওয়ান সরকার নেতাজী সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধান বিষয়ে তদন্ত করে সিক্রেট সাইফার টেলিগ্রামে ভারত সরকারকে জানিয়েছিল— ১৯৪৫ সালের ১৮ আগস্ট তথাকথিত বিমান দুর্ঘটনার কোনো প্রমাণ নেই। লেখক ও ইতিহাস গবেষক সৌম্যব্রত দাশগুপ্ত ও সৈকত নিয়োগী-র পক্ষ থেকে তাইওয়ান মিশনের অ্যাম্বাসাডর মমিন চেন-এর কাছে এই বিষয়টি বিস্তারিতভাবে জানতে চাওয়া হলে— তাইওয়ান সরকারের স্বীকৃত গবেষক ইয়েন জুং চ্যাঙের অভিমতকে মান্যতা দিয়ে তিনি উপরোক্ত নেতাজীপ্রেমীদের এই বছর (২০২৬) ১ ফেব্রুয়ারি জানান— "Taiwanese authorities do not appear to hold any official documents that conclusively confirm the death of Netaji." এবং "....there are currently no publicly stated plans by the Taiwan government to initiate a new investigation into Netaji's fate."

নেতাজী অনুগামীদের দীর্ঘদিনের আশা এবং কেন্দ্রীয় তথা রাজ্য সরকারের কাছে তাঁদের আকাঙ্ক্ষার বিষয়গুলি এদিনের সম্মেলনে উপস্থিত বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নিকট আয়োজকরা উপস্থাপন করেন। তাঁদের দাবিগুলি হলো— (১) নেতাজী অন্তর্ধান রহস্য সমাধানে সর্বশেষ তদন্ত কমিশন, অর্থাৎ বিচারপতি মনোজ কুমার মুখোপাধ্যায় কমিশনের রিপোর্ট পুনরায় সংসদে আলোচনার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে নতুন রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে অনুরোধ করা হোক। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অবিসংবাদিত নেতা নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সত্য ইতিহাস প্রকাশ্যে আনতে বিচারপতি মনোজ কুমার মুখোপাধ্যায় কমিশনের রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে নতুন তদন্ত কমিশন গঠিত হোক। (২) নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জন্মদিন 'দেশপ্রেম দিবস' হিসাবে জাতীয় ছুটির দিন ঘোষণা করা। (৩) সম্প্রতি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও পরবর্তী সময়ের ইন্টেলিজেন্স নথিপত্র 'ডিক্লাসিফায়েড' হয়ে চলেছে। বর্তমান রাজ্য সরকারের মাধ্যমে গবেষকদের কমিটি গঠন করে সেই সব দেশের মহাফেজখানা থেকে প্রকাশিত/ডিক্লাসিফায়েড নেতাজী সংক্রান্ত নথিপত্র অনুমতি ক্রমে নিয়ে এসে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনে অনলাইন ডিজিটাল আর্কাইভ গড়ে তোলার অনুরোধ কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে জানানো হচ্ছে। (৪) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন, ইতিহাস, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পাঠ্যক্রমে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নিজের ঘোষণা করা রাজনৈতিক মতাদর্শ ও অর্থনৈতিক চিন্তাধারা 'বিশেষ দার্শনিক তত্ত্ব' রূপে স্বীকৃত হোক। (৫) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সম্মানে বিশেষ চেয়ার-প্রফেসর সংরক্ষণ করা। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন টিভি নাইন বাংলা নিউজ চ্যানেলের পলিটিকাল এডিটর অনির্বাণ সিংহ, বিপ্লবী গোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পৌত্র ও পৌত্রী শান্তনু মুখোপাধ্যায় ও নীহারিকা মুখোপাধ্যায়, বিশিষ্ট ইতিহাস গবেষক কৌশিক নন্দী, বিশিষ্ট সমাজসেবী ইন্দ্রাশিস ভট্টাচার্য, জাতীয়তাবাদী সংবাদ সাপ্তাহিক 'স্বস্তিকা'র সম্পাদকীয় বিভাগের সদস্য অংশুমান গঙ্গোপাধ্যায়, 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকার সাংবাদিক প্রোথিত রায় প্রমুখ বিশিষ্টজন।

আয়োজকদের পক্ষ থেকে মূল বক্তব্য উপস্থাপনার পর অনুষ্ঠিত হয় প্রশ্নোত্তর পর্ব। সম্মেলনে উপস্থিত সাংবাদিক ও বিশিষ্টজনদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দান-সহ তাঁদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে মতামত বিনিময় করেন এদিনের অনুষ্ঠানের আয়োজকরা।

গাজোলে সংস্কার ভারতীর উদ্যোগে রবীন্দ্র জয়ন্তী উদ্‌যাপন

গত ১৯ মে সন্ধ্যায় মালদা জেলার গাজোলের শান্তি লজে সংস্কার ভারতীর স্থানীয় শাখার উদ্যোগে রবীন্দ্র জয়ন্তী উদ্‌যাপনের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ সংস্কার ভারতীর প্রান্ত সম্পাদক কিশোর কুমার সরকার, প্রান্ত সাহিত্য কলা সংযোজক শুভঙ্কর দাস,মালদা জেলা সভাপতি পরেশ চন্দ্র সরকার, জেলা মঞ্চীয় সংযোজক সঞ্জীব কুমার সরকার, গাজোল চর্চা সংযোজক অশোক মজুমদার। এছাড়াও ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের জেলা সহ কার্যবাহ দিলীপ সরকার, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের গাজোল প্রখণ্ডের সম্পাদক অনুপম গোস্বামী। প্রদীপ প্রজ্বলন ও পুষ্পার্ঘ্য নিবেদনের পর সংস্কার ভারতীর ভাবসঙ্গীত পরিবেশন করেন সংস্কার ভারতীর শিল্পীরা। প্রাস্তাবিক ভাষণ দেন পরেশ চন্দ্র সরকার। আবৃত্তি, সঙ্গীত ও নৃত্য পরিবেশনের পর সংগঠন বিষয়ে বক্তব্য রাখেন প্রান্ত সম্পাদক কিশোর কুমার সরকার। অনুষ্ঠানে গাজোলের বিধায়ক চিন্ময় দেববর্মনকে সংবর্ধনা জানানো হয়। তাঁকে উত্তরীয় পরিয়ে দেন পরেশ চন্দ্র সরকার, পুষ্পস্তবক প্রদান করেন সঞ্জীব কুমার সরকার, মেমেন্টো তুলে দেন কিশোর কুমার সরকার ও শুভঙ্কর দাস। উপস্থিত সকলেই তাঁকে মিষ্টিমুখ করান। পল্লবী ঘোষের কণ্ঠে সঙ্গীত সকলকে মুগ্ধ করে। রাষ্ট্রবন্দনার পর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

‘শ্রদ্ধা’র ১৭৩ তম শ্রদ্ধা নিবেদন অনুষ্ঠান

গত ১০ মে বীরভূম জেলার সিউড়ী শহরের বিশিষ্ট সামাজিক সংস্থা ‘শ্রদ্ধা’ তাদের ১৭৩ তম শ্রদ্ধা নিবেদন করে সিউড়ী শহরের সেহাড়াপাড়ার ৮৬ বছর বয়স্কা শ্রীমতী সন্ধ্যারানি মিশ্র মহাশয়াকে। তিনবার ওঙ্কারধ্বনি দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ করেন সংস্থার সম্পাদক ইন্দ্রজিৎ দাস। প্রদীপ প্রজ্বলন করেন সিউড়ী ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের স্বামী বরদানন্দ মহারাজ। পূজা করে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন তাঁর বৌমা তথা সংস্থার অনুভবী অধ্যাপিকা চৈতালী মিশ্র। আরতি করেন শুভ্রা ঘোষ ও সুজাতা বিষ্ণু। মাল্যার্পণ করে সঙ্গীত পরিবেশন করেন অসীমা মুখোপাধ্যায়। অর্ঘ্য হিসেবে তাঁকে উত্তরীয়, বস্ত্র, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ফল ও মিষ্টান্ন নিবেদন করেন বন্দনা দাস, শুভ্রা ব্যানার্জি, রাখী স্বর্ণকার, কৃষ্ণা মুখোপাধ্যায়। মানপত্র পাঠ করেন সংস্থার সভাপতি মহাদেব মুখোপাধ্যায়। সংস্থার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেন সহ সভাপতি আগমানন্দ মুখোপাধ্যায়।

ব্যক্তিগতভাবে শ্রীমতী মিশ্রকে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন টিনা দাস, প্রাক্তন অধ্যক্ষ মহাদেব চন্দ্র-সহ পাড়া-প্রতিবেশীরা। সঙ্গীত পরিবেশন করেন গুরু সুব্রত নন্দন, শাশ্বত মিশ্র। সকলের নজর কাড়ে নাতনি সম্ভাবী মিশ্রের ঠাকুমা সম্পর্কে বক্তব্য। অতিথি আপ্যায়ন-সহ সামগ্রিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন সুপুত্র মোহন মিশ্র। শেষে শান্তিমন্ত্র উচ্চারণ করেন সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক লক্ষ্মণ বিষ্ণু।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন শিক্ষক ও সাংবাদিক পতিত পাবন বৈরাগ্য।

প্রেস ক্লাবে 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভা'র উদ্যোগে বিপ্লবী বীর সাভারকরের জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন

গত ২৮ মে কলকাতা প্রেস ক্লাবে 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভা'র উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম নেতা, প্রখ্যাত বিপ্লবী, চিন্তাবিদ, মারাঠী কবি, সমাজ সংস্কারক, দার্শনিক ও 'হিন্দুরাষ্ট্রচেতনা'র অন্যতম উদ্গাতা বিপ্লবী বীর বিনায়ক দামোদর সাভারকরের ১৪৩তম জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠান। বিপ্লবী বীর সাভারকরের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। সংস্কার ভারতীর ভরত কুণ্ডুর কণ্ঠে জাতীয় সঙ্গীত 'বন্দে মাতরম্' পরিবেশিত হয়। এরপর শুরু হয় মূল অনুষ্ঠান। এদিন অনুষ্ঠানমঞ্চে উপস্থিত ছিলেন 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভা'র সভাপতি শম্ভুনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, কাটোয়া কলেজের ইতিহাস বিভাগের প্রধান— অধ্যাপক রবিরঞ্জন সেন, দৈনিক 'যুগশঙ্খ' পত্রিকার সাংবাদিক রক্তিম দাশ, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপিকা ড. প্রগতি বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গবাসী কলেজ (দিবা বিভাগ)-এর অধ্যক্ষা ড. হিমাদ্রি চক্রবর্তী এবং বিশিষ্ট ইতিহাস গবেষক মলয় পাতলা। হিন্দু মহাসভার কার্যকর্তাদের পক্ষ থেকে অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিশিষ্টজনদের উত্তরীয় পরিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়।

বিশিষ্টজনেরা তাঁদের বক্তব্যে বিপ্লবী বীর সাভারকরের জীবন এবং ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর অমূল্য অবদান সম্পর্কে বিশদে আলোচনা করেন। বিপ্লবী বীর সাভারকরের আদর্শে নতুন ভারত গড়ে তোলার বিষয়ে তাঁরা বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁরা বলেন যে, ১৯৪৭ সালে ভারতের অখণ্ডতা ধ্বংস হওয়ার কারণে পাকিস্তান ও বাংলাদেশে ভয়াবহ হিন্দু ও শিখ নির্যাতন সংঘটিত হয়েছে, যা এখনও অব্যাহত রয়েছে। 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভা'র পক্ষ থেকে অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিশিষ্টজনদের বীর সাভারকর রচিত 'আমার আজন্ম কারাবাস' বইটি উপহারস্বরূপ প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভা'র সাধারণ সম্পাদক অপূর্ব মণ্ডল, সংগঠন সম্পাদক অনন্ত সিংহরায়, কার্যালয় সম্পাদক অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বীর সাভারকর-বিশেষজ্ঞ সন্দীপ মুখোপাধ্যায়।

বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধি এবং অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের উপস্থিতিতে কলকাতা প্রেস ক্লাবের সম্মেলনকক্ষটি এদিন ছিল পরিপূর্ণ। বিপ্লবী বীর সাভারকরের স্বপ্নের 'অখণ্ড ভারতবর্ষ' গড়ে তোলার শপথ গ্রহণের মধ্যে দিয়ে এদিনের অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে।

সভার শেষে পশ্চিমবঙ্গের ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে বীর সাভারকরকে যোগ্য সম্মান জানাতে সর্বসম্মতিক্রমে দুটি প্রস্তাব পাশ করা হয়।

(১) পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় বীর সাভারকরের একটি প্রতিকৃতি স্থাপন করার আবেদন জানিয়ে প্রস্তাব পাশ করা হয়;

(২) ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করার লক্ষ্যে কলকাতার একটি অন্যতম প্রধান ও জনপ্রিয় সড়কের নাম পরিবর্তন করে বীর সাভারকরের নামে রাখার জন্য পৌরসংস্থাকে অনুরোধ জানিয়ে দ্বিতীয় প্রস্তাবটি পাশ করা হয়।

মহাজাতি সদনে রাসবিহারী বসুর ১৪১তম জন্মদিবস উদ্‌যাপন

গত ২৫ মে 'বিপ্লবী বসন্ত বিশ্বাস স্মারক সমিতি'র উদ্যোগে মধ্য কলকাতা-স্থিত মহাজাতি সদনে বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসুর ১৪১তম জন্মদিবস উদ্‌যাপিত হয়। এই অনুষ্ঠানে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও স্বাধীনতা সংগ্রামী পরিবারের সদস্য-সদস্যারা উপস্থিত হয়ে বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসু ও ব্রিটিশ-বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে বীরগতিপ্রাপ্ত বিপ্লবী বসন্ত কুমার বিশ্বাসের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। এদিনের অনুষ্ঠানে বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসুর মহাজীবনের বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মহাজাতি সদনের সচিব নুরুল হুদা, কলকাতা পুরসভা প্রকাশিত 'পুরশ্রী' পত্রিকার কার্যনির্বাহী সম্পাদক অনুপ চট্টোপাধ্যায়, বিপ্লবী গোপীনাথ সাহা স্মারক সমিতি ও বঙ্গীয় সাহা কমিটি-র সম্পাদক সুবীর সাহা, 'সুখবর' পত্রিকার সম্পাদক শমীক স্বপন ঘোষ, বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসুর পৌত্র পার্থসারথি বসু ও রজনীকান্ত বসু এবং ভাইঝি ইন্দ্রাণী বসু, বিপ্লবী বসন্ত কুমার বিশ্বাসের পৌত্র তরুণ বিশ্বাস, আন্দামান সেলুলার জেলে ১৪ বছর কারাজীবন অতিবাহিত করা বিপ্লবী কালীপ্রসন্ন রায়চৌধুরীর পৌত্রী কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়, 'অশোকনাথ শাস্ত্রী-গৌরীনাথ শাস্ত্রী স্মারক সমিতি'র সহ-সভাপতি তিমির রঞ্জন হালদার, চট্টগ্রাম পরিষদের সহ-সাধারণ সম্পাদক প্রদীপ কুমার দত্ত প্রমুখ বিশিষ্টজন। স্বাধীনতা সংগ্রামী মন্মথনাথ বিশ্বাসের কন্যা সনকা বিশ্বাস মহাবিপ্লবী রাসবিহারী বসুর ওপর স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। এছাড়া এদিনের 'মহাবিপ্লবী স্মরণ অনুষ্ঠান'-এ উপস্থিত ছিলেন ভারত সভা-র সদস্য ও সদস্যা হিমাংশু সাহা, অনিমেষ ঘোষ ও রমা সাহা। উপস্থিত ছিলেন 'বিপ্লবী বসন্ত বিশ্বাস স্মারক সমিতি'র সদস্য-সদস্যা বিশ্বজিৎ বসু, আরাধনা পাল, মৃত্যুঞ্জয় দে, রাধেশ্যাম সরদার, মহারাজ সরদার প্রমুখ। দেশাত্মবোধক গান পরিবেশন করেন রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বাচিক সংসদের শিল্পীবৃন্দ। এছাড়া দেশাত্মবোধক গান করেন ধ্রুব হালদার, রীনা দে, চিন্ময়ী বিশ্বাস, বর্ণালী মজুমদার প্রমুখ শিল্পী। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন 'বিপ্লবী বসন্ত বিশ্বাস স্মারক সমিতি'র সহ-সভাপতি গোপাল চক্রবর্তী। ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন 'বিপ্লবী বসন্ত বিশ্বাস স্মারক সমিতি'র সম্পাদক তথা বসন্ত কুমার বিশ্বাসের পৌত্র তরুণ বিশ্বাস।

ভারতীয় শিক্ষণ মণ্ডলের উদ্যোগে কৃতী ছাত্র-ছাত্রী সংবর্ধনা

গত ২৭ মে মালদা শহরের ললিত মোহন শ্যামমোহিনী উচ্চ বিদ্যালয়ের সভাকক্ষে ভারতীয় শিক্ষণ মণ্ডলের এক বিশেষ সভায় জেলার কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। এবছর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় জেলার প্রথম দশ স্থানাধিকারীদের সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্বামী তাপহরানন্দ মহারাজ, গাজোল মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ অমর চন্দ্র কর্মকার, টিয়াকাঠি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দেবব্রত মিশ্র, ভারতীয় শিক্ষণ মণ্ডলের উত্তরবঙ্গ প্রান্ত সম্পাদক কাজল কুমার কুণ্ডু-সহ প্রান্ত সমিতির নিবেদিতা গুপ্ত, প্রগতিকান্তি বিশ্বাস, ভাস্কর প্রামাণিক, পঙ্কজ চৌধুরী প্রমুখ। বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উত্তরবঙ্গ প্রান্ত কার্যকারিণীর সদস্য প্রবীর কুমার মিত্র। উপস্থিত অতিথিগণ ছাত্র-ছাত্রীদের পুরস্কার, স্মারক প্রদান ও শুভেচ্ছা জানিয়ে, সম্মানিত করেন। বিশেষ অতিথি প্রবীর কুমার মিত্র তাঁর ভাষণে ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ জীবনের পরিকল্পনা, চরিত্র গঠন, শৃঙ্খলা এবং জাতীয় চেতনার গুরুত্ব বিষয়ে মূল্যবান দিকনির্দেশনা দেন।

ফঃ ৪

দেশের মাটি কল্যাণ মন্দিরের উদ্যোগে গুণীজন ও শিল্পী সংবর্ধনা

গত ২০ মে দেশের মাটি কল্যাণ মন্দিরের উদ্যোগে উত্তর ২৪ পরগনার খড়দহের গঙ্গাতীরে নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র বীরভদ্র গোস্বামী প্রতিষ্ঠিত পাঁচশো বছরের পুরনো এবং শ্রীরামকৃষ্ণ স্মৃতি বিজড়িত ঐতিহ্যবাহী শ্রীশ্রী রাধা-শ্যামসুন্দর জিউর মন্দিরে জেলার গুণীজন ও শিল্পী সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে খড়দহ বিধানসভার বিধায়ক ড. কল্যাণ চক্রবর্তী এবং স্বদেশী বার্তা পত্রিকার প্রকাশক তথা আসানসোল উত্তরের বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়কে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের স্বামী প্রদীপ্তানন্দ মহারাজ। বিশেষ অতিথি রূপে ছিলেন সন্ন্যাসী সঞ্জয় শাস্ত্রী। এছাড়াও ছিলেন মন্দির কমিটির শোভন বন্দ্যোপাধ্যায়, সমাজসেবী দিতি ভট্টাচার্য, মিলন খামারিয়া এবং ডাঃ মানস সোম।

বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকীর বলিদান দিবস উদ্‌যাপন

গত ২ মে ব্রিটিশ-বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রথম বীরগতিপ্রাপ্ত বাঙ্গালি বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকীর ১১৮তম বলিদান দিবসে তাঁকে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করতে দক্ষিণ কলকাতার বেহালায় শিবরামপুরে একটি 'বিপ্লবী স্মরণ অনুষ্ঠান'- এর আয়োজন করা হয়। সম্প্রতি শিবরামপুর ননীলাল বিদ্যাপীঠের সামনে অবস্থিত সিইএসসি ট্রান্সফর্মারের গায়ে সুন্দরভাবে রং করে বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকীর প্রতিকৃতি অঙ্কন করা হয়েছে। সেই স্থানেই বিপ্লবীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মাধ্যমে তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়। এই অনুষ্ঠানের মূল উদ্যোক্তা ছিলেন বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকী মেমোরিয়াল ট্রাস্টের পক্ষ থেকে বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকীর প্রপৌত্র সুব্রত চাকী। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন বিপ্লবী পরিবারের বিশিষ্ট সদস্যবৃন্দ। উপস্থিত ছিলেন— বিপ্লবী দেবেশচন্দ্র কুণ্ডুর পৌত্র সুবীর কুমার কুণ্ডু, বিপ্লবী প্রফুল্ল কুমার সেনের কন্যা ড. পূরবী সেন, বিপ্লবী দেবেন্দ্রনাথ ঘোষের প্রপৌত্রী রমা রায়, বিপ্লবী দেবকুমার ঘোষের কন্যা মিতালী সরকার। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন 'উল্লাসকর দত্ত অ্যাকাডেমি'র পক্ষ থেকে শুভ্রকান্তি গুপ্ত ও অন্যান্য সদস্যবৃন্দ, বিশিষ্ট সাংবাদিক শমীক স্বপন ঘোষ, চলচ্চিত্র নির্মাতা অমৃতম মণ্ডল, সমাজসেবী কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবীর রায়চৌধুরী, বেবি কারফার্মা, এনজি সাহা, নবাগত অভিনেতা সৌরভ সর্দার, চিত্র সাংবাদিক সুজাতা নাগ প্রমুখ বিশিষ্টজন। এদিনের উদ্যোগটি শুধুমাত্র একটি স্মরণসভা নয়, এটি ছিল নতুন প্রজন্মের কাছে বিপ্লবীদের আত্মত্যাগের ইতিহাস পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ প্রয়াস। এই অনুষ্ঠানের আগে মহাকরণের বিপরীতে, লালদিঘির ধারে প্রতিষ্ঠিত বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকীর আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে বরেণ্য বিপ্লবীর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেন সুব্রত চাকী, সানিকা চাকী রায় ও সৌরদীপ রায়।

মহাজাতি সদনে বিপ্লবী বসন্ত বিশ্বাসের আত্মোৎসর্গ দিবস উদ্‌যাপন

গত ১১ মে 'বিপ্লবী বসন্ত বিশ্বাস স্মারক সমিতি'র উদ্যোগে মধ্য কলকাতা-স্থিত মহাজাতি সদনে ব্রিটিশ-বিরোধী স্বাধীনতা যুদ্ধে বীরগতিপ্রাপ্ত বিপ্লবী বসন্ত কুমার বিশ্বাসের ১১২তম আত্মোৎসর্গ দিবস উদ্‌যাপিত হয়। বিপ্লবী স্মরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলে বিপ্লবী বসন্ত কুমার বিশ্বাস ও বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসুর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পরিবারের অনেক সদস্য ও সদস্যা-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এদিন বিপ্লবীর স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন মহাজাতি সদনের সচিব নুরুল হুদা, বিপ্লবী বসন্ত কুমার বিশ্বাসের পরিবারের সদস্যা এমিলি বিশ্বাস ও কল্পনা বিশ্বাস, 'বিপ্লবী বসন্ত বিশ্বাস স্মারক সমিতি'র সদস্য রাধেশ্যাম সরদার, নবকুমার পাল, মৃত্যুঞ্জয় দে, বিপ্লবী মন্মথনাথ বিশ্বাসের কন্যা সনকা বিশ্বাস, বিপ্লবী আশুতোষ রায়চৌধুরীর পৌত্র জয়দীপ রায়চৌধুরী, স্বাধীনতা সংগ্রামী হরেন্দ্রনাথ বাগচী বিশ্বাস, চট্টগ্রাম পরিষদের সহ-সাধারণ সম্পাদক প্রদীপ কুমার দত্ত, ভারত সভার কাউন্সিল সদস্য হিমাংশু সাহা, 'অশোকনাথ শাস্ত্রী-গৌরীনাথ শাস্ত্রী স্মারক সমিতি'র সহ-সভাপতি তিমির রঞ্জন হালদার, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অপ্রতিম বসু, গায়িকা সবিতা বসু, চিত্র সাংবাদিক সুজাতা নাগ প্রমুখ বিশিষ্টজন। নদীয়া জেলার পোড়াগাছা গ্রামে নীলবিদ্রোহের মহান নেতা দিগম্বর বিশ্বাসের বংশে ১৮৯৫ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন বসন্ত কুমার বিশ্বাস। ১৯১০ সালে তৎকালীন বিপ্লবী নেতৃত্বের সংস্পর্শে এসে যুগান্তর দলে যোগ দেন। ১৯১২ সালে ২৩ ডিসেম্বর বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে দিল্লিতে বড়লাট হার্ডিঞ্জের শোভাযাত্রায় বোমা ছুঁড়ে বড়লাটকে গুরুতরভাবে আহত করেন। পরবর্তীকালে পিতার ঘাটশ্রাদ্ধের দিন কৃষ্ণনগরে এলে জনৈক আত্মীয়ের বিশ্বাসঘাতকতায় পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। বসন্ত কুমার বিশ্বাস নাবালক হওয়া সত্ত্বেও বিচার চলাকালীন ইংরেজ সরকার তাঁর বয়স দু'বছর বাড়িয়ে তাঁকে সাবালক প্রমাণ করে ফাঁসির আদেশ দেয়। ১৯১৫ সালের ১১ মে পঞ্জাবের আম্বালা সেন্ট্রাল জেলে মাত্র ২০ বছর বয়সে বিপ্লবী বসন্ত কুমার বিশ্বাসের ফাঁসি হয়। এদিন স্বাধীনতা সংগ্রামে বীরগতিপ্রাপ্ত এই বিপ্লবীর স্মরণ অনুষ্ঠানে একাধিক দেশাত্মবোধক গান পরিবেশন করেন বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী রীনা দে। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন 'বিপ্লবী বসন্ত বিশ্বাস স্মারক সমিতি'র সহ-সভাপতি গোপাল চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানটির আয়োজন ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন 'বিপ্লবী বসন্ত বিশ্বাস স্মারক সমিতি'র সম্পাদক তথা বিপ্লবী বসন্ত কুমার বিশ্বাসের পৌত্র তরুণ বিশ্বাস।

ভঁওরলাল মল্লাবত সেবাকেন্দ্র সু-জোক ও আয়ুর্বেদিক আকুপ্রেশার প্রশিক্ষণ শিবির

সেবা ভারতীর অন্তর্গত চিকিৎসা সেবা পরিষেবা-রত ভঁওরলাল মল্লাবত সেবাকেন্দ্রের উদ্যোগে কলকাতার ৪২ নং কালীকৃষ্ণ ঠাকুর স্ট্রিটের কার্যালয়ে গত ২৮ মে পঞ্চদিবসীয় সু-জোক ও আয়ুর্বেদিক আকুপ্রেশার প্রশিক্ষণ শিবিরের শুভারম্ভ হয়। শিবিরে অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের দ্বারা শিক্ষার্থীদের সু-জোক ও আকুপ্রেশার চিকিৎসার মাধ্যমে বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রশিক্ষক হিসেবে শিক্ষার্থীদের হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেন ডাঃ প্রদীপ আগরওয়াল, ডাঃ সুনীতা রাঠী এবং ডাঃ রশ্মি কাজরিয়া।

প্রশিক্ষণ শিবিরের সমাপ্তি দিবসে শিক্ষার্থী সীমা সাওনসুখা, রুচিকা করনানী, অনীতা আগরওয়াল এবং রীমা জয়সোয়াল তাদের নিজের নিজের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেন। শিক্ষার্থীদের হাতে শংসাপত্র তুলে দেন অরুণ প্রকাশ মল্লাবত, সঞ্জয় রস্তোগী এবং উর্মিলা ধ্যাওয়ালা। সমাপ্তি অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন অরুণ প্রকাশ মল্লাবত এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ডাঃ সুরেশ গুপ্তা।

শ্রীবড়াবাজার কুমারসভা পুস্তকালয়ের বিবেকানন্দ সেবা সম্মান সমারোহ

গত ৩০ মে কলকাতার সুপ্রসিদ্ধ সামাজিক-সাহিত্যিক সংস্থা শ্রীবড়াবাজার কুমারসভা পুস্তকালয়ের উদ্যোগে ন্যাশনাল লাইব্রেরির সভাকক্ষে ৪০ তম 'বিবেকানন্দ সেবা সম্মান-২০২৬' সমারোহের আয়োজন করা হয়। এবারের সেবা সম্মান প্রদান করা হয় দিব্যাঙ্গমুক্ত ভারত আন্দোলনের প্রাণপুরুষ তথা পরমার্থ নিকেতন (ঋষিকেশ)-এর সংস্থাপক অধ্যক্ষ পূজ্য স্বামী চিদানন্দ সরস্বতী মহারাজকে। অনুষ্ঠানে মুখ্য অতিথিরূপে ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পঞ্চায়েত, গ্রামবিকাশ, কৃষি ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন প্রখ্যাত আয়কর পরামর্শদাতা সজ্জন কুমার তুলস্যান। অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বামী বিবেকানন্দ বিষয়ক গান 'ও বরেণ্য যোদ্ধা সন্ন্যাসী' পরিবেশন করেন শ্রীমতী মীতা গাড়োদিয়া। স্বাগত ভাষণ দেন কুমারসভা পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষ মহাবীর বজাজ।

অজয়েন্দ্রনাথ ত্রিবেদীর কণ্ঠে বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে খুশবু বজাজ, শরণ্যা দূগড়, পূজ্য স্বামী চিদানন্দ সরস্বতী মহারাজকে তিলক পরিয়ে এবং সজ্জন কুমার তুলস্যান, ভাগীরথ চাণ্ডক, বংশীধর শর্মা, রাধেশ্যাম গোয়েঙ্কা এবং দিলীপ ঘোষ শাল, শ্রীফল, ১ লক্ষ টাকার চেক ও মানপত্রের দ্বারা সম্মানিত করেন। বিনোদ বাগড়োদিয়া, মহাবীর প্রসাদ রাওত, আচার্য রাকেশ কুমার পাণ্ডে এবং নন্দকুমার লোঢা উপস্থিত অতিথিবর্গকে মাল্যার্পণে ভূষিত করেন। সেবা সম্মানে ভূষিত হয়ে পূজ্য মহারাজ তাঁর ভাষণে বলেন, সনাতন ধর্ম থাকলে ভারত থাকবে আর ভারত থাকলে সনাতন ধর্ম থাকবে। সনাতন ধর্ম সকলের জন্যই। আমরা সবাই ব্যক্তিগতভাবে দেবভক্তি করব কিন্তু আজ সময় এসেছে সকলকে একসঙ্গে দেশভক্তি করতে হবে। সনাতন ধর্মের কথা হলো নিজে বাঁচো আর সবাইকে বাঁচতে দাও। এখন লড়াই করে শেষ হয়ে যাবার সময় নয়, একসঙ্গে বেঁচে থাকার সময়। আজ মানবতার প্রয়োজনে মহান ভারতের প্রয়োজন।

মুখ্য অতিথি দিলীপ ঘোষ বলেন, মনীষীদের ভূমি পশ্চিমবঙ্গে আজ পরিবর্তন এসেছে। এটি হিন্দুদের সংগঠিত হওয়ার পরিণাম। বিশেষ অতিথি সজ্জন কুমার তুলস্যান বলেন, কুমারসভা পুস্তকালয় স্বামী বিবেকানন্দের সেবা ভাবনার বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে বিবেকানন্দ সেবা সম্মান প্রদান করে চলেছে, এটা একটি প্রশংসাযোগ্য উদ্যোগ। অনুষ্ঠানের অধ্যক্ষ রাধেশ্যাম গোয়েঙ্কা স্বামী চিদানন্দ সরস্বতী মহারাজের সেবাকাজের অকুণ্ঠ প্রশংসা করেন। সমগ্র অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সংস্থার সাহিত্যমন্ত্রী ডঃ তারা দূগড় এবং কল্যাণ মন্ত্র পাঠ করে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন সংস্থার উপমন্ত্রী সত্যপ্রকাশ রায়। অনুষ্ঠানে কলকাতা ও হাওড়া মহানগরের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

নিষ্কাম কর্ম, ভক্তি, জ্ঞান ও কৃপা
এক সাধনপথের সমগ্র রূপ

অনামিক রায়

মানুষের জীবনে কর্ম অনিবার্য। দেহ আছে, ইন্দ্রিয় আছে, মন আছে, তাই কর্ম চলতে থাকবে। দেখা, শোনা, বলা, চলা, ভাবা, সিদ্ধান্ত নেওয়া— সবই কর্মের অন্তর্ভুক্ত। তাই 'কর্ম করব না'— এই সংকল্প আসলে বাস্তবসম্মত নয়। কিন্তু কর্ম মানুষের বন্ধনের কারণও হতে পারে, আবার মুক্তির সোপানও হতে পারে। পার্থক্যটি কোথায়? পার্থক্যটি কর্মে নয়; কর্মের ভেতরের মনোভাব, অর্থাৎ কামনা, আসক্তি ও কর্তার অহংকারে।

যখন কর্ম ফল লাভের উদ্দেশ্যে, স্বার্থসিদ্ধির আকাঙ্ক্ষায় বা 'আমি কর্তা' এই বোধে সম্পন্ন হয়, তখন সেই কর্ম বন্ধন সৃষ্টি করে। আবার যখন একই কর্ম ভগবৎভক্তি, অনাসক্তি, ন্যায়, সত্য, সারল্য ও কর্তব্যবোধ নিয়ে করা হয়, তখন সেই কর্মই হয়ে ওঠে যজ্ঞ, পবিত্র সাধনা। এটাই নিষ্কাম কর্মের মর্ম।

কর্ম থেকে যজ্ঞ : নিত্য জীবনে আমরা অসংখ্য কাজ করে থাকি জীবিকা অর্জন, পরিবার প্রতিপালন, সামাজিক দায়িত্ব পালন, নিজের উন্নতি সাধন। সাধারণভাবে এগুলো জাগতিক কাজ। কিন্তু যখন এই কাজগুলোর মধ্যে ভগবৎ স্মৃতি রাখা যায়, যখন মনে থাকে, 'আমি কর্তব্য করছি, ফল ঈশ্বরের হাতে'; তখন সেই জাগতিক কাজই যজ্ঞ হয়ে ওঠে। যজ্ঞ মানে কেবল আগুনে আহুতি নয়; যজ্ঞ মানে নিজের কামনা, অহংকার, আসক্তিকে অন্তরের অগ্নিতে আহুতি দেওয়া। এই অবস্থায় কাজ আর নিছক কাজ থাকে না, কাজটাই সাধনা হয়ে ওঠে।

বাহ্য সন্ন্যাস বনাম অন্তরের সন্ন্যাস : আমরা অনেক সময় ভাবি— সন্ন্যাস মানে কাজ ছেড়ে দেওয়া, সংসার ছেড়ে দেওয়া, দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া। বাইরে থেকে দেখলে সত্যিই তাই মনে হয়। কিন্তু গীতা যে জায়গাটায় আলোক ফেলেছে, তা বাইরে নয়, অন্তরে। মানুষ যদি বাইরের সব কাজ ছেড়ে দেয়, কিন্তু মনে মনে ভোগ, কামনা, স্মৃতি, আকাঙ্ক্ষা, দুঃখ, ক্ষোভ— এসব নিয়েই বেঁচে থাকে, তাহলে সে আসলে কর্ম থেকে দূরে যায়নি। তার ইন্দ্রিয় কাজ না করলেও, তার মন ভোগের মধ্যে ডুবে আছে। এই অবস্থাকে গীতা 'মিথ্যাচার' বলেছে;কারণ বাইরে সন্ন্যাস, ভিতরে আসক্তি। এ যেন নদীর ওপরে সেতু বন্ধ, কিন্তু ভিতরে ভিতরে জল বইছেই।

এর উল্টো ছবিটা দেখুন। একজন মানুষ সংসারে আছে। অফিস করছে, পরিবার সামলাচ্ছে, সমাজে চলছে। বাইরে তার কোনো সন্ন্যাস নেই। কিন্তু ভিতরে সে ফলের দাবিহীন, কামনাহীন, কর্তার অহংহীন হয়ে কাজ করছে। সে জানে— কর্তব্য করছি, ফল আমার নয়। সে নিজের জন্য নয়, কর্তব্যবোধ থেকে কাজ করছে। তার মন ভোগচিন্তায় নয়, শান্ত স্মৃতিতে স্থিত। এই মানুষটিই প্রকৃত সন্ন্যাসী। কারণ সন্ন্যাসের আসল অর্থ কর্মত্যাগ নয়, আসক্তিত্যাগ।

সন্ন্যাস মানে বাহিরের পরিত্যাগ নয়, অন্তরের আলগা হয়ে যাওয়া।

তাই বলা হয়— সংসারে থেকেও সন্ন্যাসী হওয়া যায়। আবার কেউ যদি সত্যিই সংসার ত্যাগ করে, কিন্তু অন্তরেও সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়, তবে তিনি মহাসন্ন্যাসী। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই মূল বিচার একটাই— মন কোথায় আছে।

কর্তব্য পালন করা বন্ধ নয়, বরং কর্তব্য

পালনই চলবে। শুধু সেই কর্তব্যের সঙ্গে ‘আমার’, ‘আমাকে’, ‘আমার জন্য’— এই দাবিগুলো থাকবে না।

এই জায়গাটা বোঝা গেলে দেখা যায়, সন্ন্যাস কোনো বাহ্য রূপ নয়। এটি এক অন্তর্গত অবস্থা— যেখানে কাজ চলতে থাকে, কিন্তু কর্মের সঙ্গে মন জড়িয়ে থাকে না।

নিত্যকর্ম কী?

নিত্যকর্ম মানে নির্দিষ্ট আচার নয়; নিত্যকর্ম মানে প্রতিদিনের সমস্ত কাজকে ভগবৎভাবের সঙ্গে যুক্ত করে করা। সারাদিনে যা কিছু করি, তা যদি স্মরণ রেখে করি যে, এই কাজও ঈশ্বরার্পণ, তবে সেটাই নিত্যকর্ম। এই ভগবৎ স্মৃতি না থাকলে, একই কাজ বন্ধনের কারণ হয়। দেহ সুস্থ রাখা, জীবিকা অর্জন, সংসারের দায়িত্ব পালন— এসবও নিত্যকর্ম, যদি তা অনাসক্ত হৃদয়ে ন্যায়, সত্য, সারল্যের সঙ্গে সম্পন্ন হয়।

কর্মে অকর্ম যখন কর্ম ফলের উদ্দেশ্যে নয়, তখন তা ‘অকর্মতুল্য’। অর্থাৎ কর্ম হচ্ছে, কিন্তু বন্ধন তৈরি করছে না। জ্ঞানকর্মযোগীর কর্ম এরকমই; তিনি কাজ করেন, কিন্তু ফলের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেন না। তাই কর্ম তাকে বাঁধে না। এই অবস্থায় ধীরে ধীরে মন পরিষ্কার হয়। কামনা ক্ষীণ হয়। ‘আমি কর্তা’ এই অহংকার নরম হতে থাকে। ভগবৎ স্মৃতি গভীর হয়। এখানেই ভক্তির জন্ম। কামনাশূন্য মনে যখন কর্ম করা হয়, তখন হৃদয়ে এক ধরনের পবিত্রতা উৎপন্ন হয়। সেই পবিত্রতা থেকেই ভক্তির জন্ম। তখন ঈশ্বর স্মরণ আর আলাদা করে করতে হয় না; কর্মের মধ্যেই ঈশ্বর স্মরণ ঘটে। এই অবস্থায় কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞান আলাদা থাকে না। তিনটি একসঙ্গে মিশে যায়। কাজটাই ভক্তি, কাজটাই জ্ঞান, কাজটাই সাধনা হয়ে ওঠে।

কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞান— আলাদা ধাপ নয়, এক সাধনার অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ ।

মানুষের সাধনাজীবনকে আমরা অনেক সময় তিন ভাগে ভাগ করি— কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞান। মনে হয়, এ তিনটি যেন আলাদা পথ : কেউ কর্মের পথে, কেউ ভক্তির পথে, কেউ জ্ঞানের পথে চলে। কিন্তু গভীরভাবে দেখলে বোঝা যায়, এগুলো তিনটি পৃথক পথ নয়, বরং একই পথের তিনটি স্বাভাবিক পর্যায়। নীচে দাঁড়িয়ে আলাদা মনে হলেও, উপরে উঠলে দেখা যায়— তিনটিই একই চূড়ায় নিয়ে যায়। এই সম্পর্কটি বোঝার চাবিকাঠি হলো নিষ্কাম কর্ম। প্রথমে মানুষ কর্মের মধ্যেই থাকে। সংসার, দায়িত্ব, জীবিকা— সবই তার জীবনের অংশ। এই কর্মের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই থাকে ফলের আশা, স্বার্থ— ‘আমি করছি’ এই কর্তার বোধ। এখন সে যদি শুনতে পায়— কামনাহীন হয়ে কর্তব্য করো, ফলের প্রতি আসক্তি ছেড়ে দাও, তবে সে চেষ্টা শুরু করে। এখানেই নিষ্কাম কর্মের সূচনা। যখন সে ফলের দাবি ছেড়ে দিয়ে কেবল কর্তব্য করতে শেখে, তখন তার ভিতরে একটি সূক্ষ্ম পরিবর্তন ঘটে। সে অনুভব করতে শুরু করে— ফল তার হাতে নয়। এই উপলব্ধি তাকে নিজের সীমা চিনতে শেখায়। আর নিজের সীমা চিনলেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে সে স্বীকার করে— কেউ একজন আছেন, যাঁর হাতে ফল নির্ভর করছে। এই স্বীকারোক্তিই ভক্তির সূচনা। অর্থাৎ, নিষ্কাম কর্ম মানুষকে ঈশ্বরের দিকে ঠেলে দেয়। ভক্তি আলাদা করে তৈরি করতে হয় না— নিষ্কাম কর্ম থেকেই তা জন্ম নেয়। ভক্তি আসার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মন নরম হতে থাকে। অহংকার, হিংসা, প্রতিযোগিতা, রাগ— এসব ধীরে ধীরে কমতে থাকে। কারণ মন আর স্বার্থকেন্দ্রিক থাকে না, ঈশ্বরকেন্দ্রিক হতে শুরু করে। এই অবস্থাকে বলে চিত্তশুদ্ধি। ভক্তির কাজই হলো মনকে পরিষ্কার করা। মন পরিষ্কার না হলে জ্ঞান সম্ভব নয়। জ্ঞান মানে শুধু বইয়ের তথ্য নয়, ‘জ্ঞান’ মানে নিজের প্রকৃত স্বরূপকে উপলব্ধি করা। কিন্তু কামনা ও অহংকারে ভরা মন নিজেকে স্পষ্ট দেখতে পায় না। যখন ভক্তির প্রভাবে মন শান্ত ও নির্মল হয়, তখনই মানুষের ভিতরে প্রশ্ন জাগে— আমি কে? কে কর্তা? আসলে কে কাজ করছে? এই প্রশ্ন থেকেই জ্ঞানের উদয়। জ্ঞানের আলো ফুটতেই মানুষ বুঝতে পারে— প্রকৃতি কাজ করছে, ইন্দ্রিয় কাজ করছে, আমি কেবল সাক্ষী। তখন ‘আমি কর্তা’ এই অহংকার ভেঙে পড়ে। অহং ক্ষীণ হলে আসক্তিও ক্ষীণ হয়। তখন নিষ্কাম কর্ম আর চেষ্টা করে করতে হয় না; তা স্বাভাবিক হয়ে যায়।

অর্থাৎ, যে নিষ্কাম কর্ম মানুষ শুরুতে সচেতনভাবে চেষ্টা করে করছিল, জ্ঞান প্রাপ্তির পরে সেটাই তার স্বভাব হয়ে দাঁড়ায়। এখানেই চক্রটি সম্পূর্ণ হয়— নিষ্কাম কর্ম থেকে ভক্তি, ভক্তি থেকে চিত্তশুদ্ধি, চিত্তশুদ্ধি থেকে জ্ঞান, জ্ঞান থেকে অহংক্ষয়, আর অহংক্ষয় থেকে স্বতঃস্ফূর্ত নিষ্কাম কর্ম। এই ধারাটি সরলরেখা নয়, একটি বৃত্ত। একটি অন্যটিকে জন্ম দেয় এবং শেষে আবার প্রথমটিকেই সহজ করে তোলে। তাই কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞানকে আলাদা পথ বলা ঠিক নয়। এগুলো একই সাধনার ধারাবাহিক রূপ, যা মানুষকে ধীরে ধীরে সেই চূড়ান্ত স্থিতির দিকে নিয়ে যায়, যেখানে কর্ম আর বন্ধন নয়, ভক্তি আর আলাদা সাধনা নয়, জ্ঞান আর কেবল চিন্তা নয়— সব একসঙ্গে মিলিত হয়ে জীবনের স্বাভাবিক প্রকাশ হয়ে ওঠে।

এই উপলব্ধিতেই বোঝা যায়, সাধনার আসল রহস্য বাইরে কোনো বিভাজনে নয়, অন্তরের ধারাবাহিক পরিশুদ্ধিতে।

কৃপা ও পুরুষকার : ধরা যাক, একজন মানুষ সত্যিই নিষ্কাম কর্ম করার চেষ্টা করছে। সে নিয়ম মেনে চলছে, সতর্ক আছে, নিজের কামনা লক্ষ্য করছে, ফলের আশা কমাতে চাইছে। বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে— সে অনেক এগিয়েছে। কিন্তু ভিতরে সে টের পায়, মন বারবার পুরোনো অভ্যাসে ফিরে যাচ্ছে। অহংকার, আসক্তি, অস্থিরতা— কিছুতেই পুরোপুরি ছাড়তে চায় না। এখানেই বোঝা যায়, শুধু চেষ্টা দিয়ে মনকে পুরো বদলানো যায় না। পুরুষকার বা চেষ্টা কী করতে পারে? চেষ্টা মানুষকে প্রস্তুত করে। সে নিজের ভিতরকে পরিষ্কার করার কাজ শুরু করে। যেমন কেউ ঘর ঝাঁট

দেয়, জানালা খোলে, ধুলো সরায়। কিন্তু আলো সে নিজে বানাতে পারে না। আলো বাইরে থেকেই আসে। তার কাজ কেবল জানালা খোলা। এই জানালা খোলাই পুরুষকার। আলো ঢোকাই কৃপা। মানুষ যখন সত্যিই আন্তরিকভাবে চেষ্টা করতে থাকে— কামনা কমাতে, অনাসক্ত থাকতে, ভগবৎ স্মৃতি রাখতে— তখন তার ভিতরে এক ধরনের নম্রতা আসে। সে বুঝতে শুরু করে, 'আমি যতই চেষ্টা করি, সব আমার নিয়ন্ত্রণে নয়।' এই বিনয়, এই স্বীকারোক্তিই কৃপা অবতরণের উপযুক্ত ক্ষেত্র তৈরি করে। কৃপা মানে কোনো অলৌকিক ঘটনা নয়। কৃপা মানে— মন হঠাৎ অকারণে শান্ত হয়ে যাওয়া, পুরোনো আসক্তি নিজের থেকেই আলগা হয়ে যাওয়া, ভগবৎভাব সহজ হয়ে যাওয়া। যেটা এতদিন জোর করে করতে হচ্ছিল, সেটা একসময় স্বাভাবিক হয়ে যায়। এই পরিবর্তন মানুষ নিজে ঘটাতে পারে না; সে কেবল তার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে পারে। তাই বলা হয়— চেষ্টা দরকার, কারণ চেষ্টা ছাড়া দরজা বন্ধই থাকে। কৃপা দরকার, কারণ দরজা খুললেও আলো নিজে আসে না। যখন এই দুই একসঙ্গে হয়, মানুষের আন্তরিক চেষ্টা এবং ঈশ্বরের অদৃশ্য স্পর্শ— তখন সাধনা সত্যিই ভিতরে কাজ করতে শুরু করে। তখন নিষ্কাম কর্ম আর কঠিন মনে হয় না, ভগবৎ স্মৃতি আর জোর করে রাখতে হয় না, মন নিজেই শুদ্ধ হতে থাকে। এই কারণেই বলা হয়— পুরুষকার পথ তৈরি করে, কৃপা সেই পথে মানুষকে এগিয়ে নেয়।

দ্বৈত ও অদ্বৈত— বৈপরীত্য নয় : সাধনার শুরুতে মানুষ নিজেকে দেহ-মন-বুদ্ধির সঙ্গে এক করে দেখে। তার অভিজ্ঞতায় জগৎ আলাদা, ঈশ্বর আলাদা এবং 'আমি' আলাদা। এই অবস্থায় ঈশ্বর যেন একজন মহান আশ্রয়, দূরে অথচ কাছে। তখন প্রার্থনা স্বাভাবিক হয়, কৃপা প্রার্থনা সত্য হয়ে ওঠে, ভক্তি হৃদয়ে জায়গা নেয়। এই দ্বৈত অনুভূতি কোনো ভ্রম নয়— সাধকের অবস্থান অনুযায়ী এটি সম্পূর্ণ সত্য। কারণ তার চেতনা এখনো 'ভেদ' দেখেই চলেছে। এই স্তরে সে বলে— 'হে ঈশ্বর, আপনি আমাকে টেনে নিন, আপনি আমার মন শুদ্ধ করুন।'এখানে ঈশ্বর কর্তা, আমি প্রার্থী। কিন্তু নিষ্কাম কর্ম, ভক্তি ও অন্তঃশুদ্ধির ধারায় মন যখন ক্রমে স্বচ্ছ হতে থাকে, তখন চেতনার ভিতরে একটি মৌলিক পরিবর্তন ঘটে।

মানুষ ধীরে ধীরে লক্ষ্য করে— ঈশ্বরকে সে বাইরে খুঁজছিল, কিন্তু তাঁর স্পর্শ ভিতরেই অনুভূত হচ্ছে। প্রার্থনা করতে করতে, ভক্তি করতে করতে, একসময় মনে হয়— যাঁর দিকে হাত বাড়িয়ে ছিলাম, তিনি তো আমার হৃদয়ের গভীরেই অবস্থান করছেন। এই উপলব্ধি বুদ্ধির দ্বারা তৈরি হয় না— এটি এক ধরনের অন্তর জাগরণ। তখন দ্বৈত অনুভূতি নিজে থেকেই আলগা হতে থাকে। 'আমি' ও 'তিনি'— এই ভেদরেখা ঝাপসা হয়ে যায়। ভক্তি তখন আর বাহ্য আরাধনা থাকে না, তা অন্তরের নীরব স্থিতি হয়ে ওঠে। এখানেই অদ্বৈত অনুভবের সূচনা। তখন বোঝা যায়— কৃপা বাইরে থেকে আসেনি। কৃপা মনে ছিল, অন্তরের আবরণ সরে গিয়ে সেই চৈতন্যের প্রকাশ, যা সর্বদা উপস্থিত ছিল। এতদিন অহং, কামনা, অস্থিরতা সেই উপস্থিতিকে ঢেকে রেখেছিল।

সাধনা সেই আবরণ সরিয়েছে, আর কৃপা সেই আবরণ সরার মুহূর্তে চৈতন্যকে প্রকাশ করেছে। এই অবস্থায় ঈশ্বর আর 'অন্য' নন। তিনি নিজের স্বরূপ বলেই প্রতিভাত হন। তখন প্রার্থনা বদলে যায়। আর কিছু চাওয়ার থাকে না। কেবল এক প্রশান্ত, নিবিড় অনুভব থাকে— সবই সেই এক চৈতন্যের প্রকাশ। দ্বৈত তখন অদ্বৈতে বিলীন হয়। কিন্তু দ্বৈতকে অস্বীকার করে নয়, কারণ দ্বৈতই ছিল অদ্বৈতের দিকে যাওয়ার সোপান। এই কারণেই বলা হয়— দ্বৈত ও অদ্বৈত বিরোধ নয়। সাধনার পথে দ্বৈত সত্য, সিদ্ধির স্তরে অদ্বৈত সত্য। আর কৃপা এই দুইয়ের মধ্যে সেতুবন্ধনের মতো কাজ করে, যা ভক্তিকে জ্ঞানে, আর জ্ঞানকে স্থিতিতে পরিণত করে।

শেষ পর্যন্ত সাধনার পথ খুব জটিল কিছু নয়— খুব স্বাভাবিক, খুব নীরব, খুব মানবিক একটি যাত্রা। আমরা কাজ করতেই থাকি। সংসার, দায়িত্ব, মানুষজন, সম্পর্ক— সব চলতেই থাকে। কিন্তু একসময় ভিতরে একটি সূক্ষ্ম পরিবর্তন ঘটে। আমরা কাজের ধরন বদলাই না, বদলাই কাজ করার মন। ফলের দাবি একটু একটু করে আলগা করি, কর্তার অহং একটু একটু করে নরম করি, আর মনে মনে একটি স্মৃতি ধরে রাখি— সবই ঈশ্বরার্পণ। এই সামান্য পরিবর্তনই ধীরে ধীরে অসামান্য হয়ে ওঠে। কাজ করতে করতে মন পরিষ্কার হয়। মন পরিষ্কার হতে হতে ভক্তি জন্মায়। ভক্তি গভীর হতে হতে জ্ঞান ফুটে ওঠে। জ্ঞান জেগে উঠলে আসক্তি নিজে থেকেই ঝরে যায়। তখন আর নিষ্কাম কর্ম করতে হয় না— নিষ্কাম কর্ম নিজেই স্বভাব হয়ে দাঁড়ায়।

এই অবস্থায় মানুষ দেখে— সে একই কাজ করছে, একই পৃথিবীতে আছে, কিন্তু ভিতরে এক গভীর প্রশান্তি, এক অচঞ্চল স্থিতি। কারও প্রতি হিংসা নেই, দাবি নেই, অস্থিরতা নেই। সকলের প্রতি সুহৃদভাব, নিজের প্রতি শান্তি, আর অন্তরে এক নীরব আনন্দ। এটাই ব্রাহ্মীস্থিতি। এটাই নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি। এটাই জীবন্মুক্তির সূক্ষ্ম স্বাদ। তখন বোঝা যায়;ত্যাগ করতে কিছুই হয়নি। সংসার ছেড়ে যেতে হয়নি। কাজ বন্ধ করতে হয়নি। কেবল কামনা, আসক্তি আর অহংকারের আবরণগুলো আস্তে আস্তে ঝরে গেছে। আর সেই আবরণ সরতেই অন্তরের চিরন্তন সত্য নিজে থেকেই প্রকাশ পেয়েছে। তাই পথটি তর্কের নয়, জটের নয়। পথটি খুব সরল, শান্ত মনে, অনাসক্ত হয়ে, ভগবৎ স্মৃতি রেখে নিজের কর্তব্য করে যাওয়া। ধীরে ধীরে কর্মই সাধনা হয়ে ওঠে, সাধনাই স্থিতি হয়ে ওঠে, আর সেই স্থিতিতেই অনুভব হয়;যাকে এতদিন খুঁজছিলাম, তিনি তো এই জীবনেই, এই কর্মেই, এই নীরব হৃদয়ের মধ্যেই সর্বদা ছিলেন। এ অনুভবের পর আর কিছু বলার থাকে না। শুধু ভিতরে মৃদু এক বিস্ময় জাগে— আহা, এত সহজ ছিল! ▯

বিজ্ঞান সাধনায় প্রাচীন ভারতবর্ষ

অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়

বিজ্ঞানী ঋষিরা খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ অব্দের আগে থেকেই ধাতুবিদ্যা নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। খ্রিস্টীয় একাদশ অব্দের মধ্যে কিছু চিকিৎসক, রসায়নবিদ ও কিছু গুহ্য ক্রিয়াকলাপকারী সাধকদের অনলস প্রচেষ্টা ও পরীক্ষার মাধ্যমে অনেক নতুন নতুন ধাতব যৌগিক আবিষ্কৃত হয়। ওষুধ হিসেবে পারদ ও পারদঘটিত নানা দ্রব্যের গুণাগুণ নিয়ে তাঁরা গবেষণা করেন। নাগার্জুন এই বিষয়ে এক উল্লেখযোগ্য নাম। রসায়ন প্রকৃতপক্ষে পারদ বিজ্ঞান, কারণ পারদের আর এক নাম রস। নাগার্জুন তাঁর 'রস রত্নাকর'-এ হিঙ্গুল (পারদ ৮৬.২ শতাংশ + গন্ধক বা Hgs ১৩.৮ শতাংশ) বা সিঁদুর থেকে পাতন প্রক্রিয়ায় পারদ প্রস্তুত করার প্রণালীর সঙ্গে সঙ্গে কপার পাইরাইটিস (তাম্রমাক্ষিক বা $Cu\ FeS_2$) থেকে তামা ও রসক বা ক্যালামাইন ($ZnCo_3$) থেকে দস্তা নিষ্কাশনের পদ্ধতির কথা লিখে গেছেন। মজার কথা— পারদ, তামা বা দস্তার এগুলি খুবই সস্তা ও সহজলভ্য উৎস।

আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় তাঁর 'হিস্ট্রি অব হিন্দু কেমিস্ট্রি' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন একটি প্রাচীন রসায়ন গ্রন্থ 'রসার্ণব'-এর কথা। প্রাচীন রসায়ন বিজ্ঞানীদের একটি গোষ্ঠী এই 'রসার্ণবে'-র রচয়িতা। মূলত দ্বাদশ শতাব্দী থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যে এটি রচনা হয়। বিভিন্ন রঙের কাচ তৈরিতে কী কী ধাতু ব্যবহৃত হবে এবং রসায়ন পরীক্ষাগারে যে সব যন্ত্রপাতি ব্যবহার হবে তার বিস্তৃত বর্ণনা এই গ্রন্থে দেওয়া আছে। শুধু কাচ তৈরি নয়, পরকলা বা লেন্স তৈরি (উত্তল ও অবতল) ও তার সাহায্যে অগ্নি উৎপাদন অর্থাৎ আলোক বিজ্ঞানের চর্চাতেও তাঁরা অভিজ্ঞ ছিলেন। প্রথম শতাব্দীতে ঐতিহাসিক প্লিনি লিখে গেছেন— 'জগতে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট কাচ তৈরি হতো ভারতে।' কৌটিল্যের অর্থ শাস্ত্রেও কাচ ও লেন্সের ব্যবহারের উল্লেখ আছে।

সনাতনী হিন্দুরা একদিকে যেমন সোনার প্রথম ব্যবহার শিখেছিল তেমনই লৌহ আকরিক থেকেও তারা উন্নতমানের লোহা প্রস্তুত করতে পারতো। এর প্রমাণ আজও মেহরোলিতে, দিল্লির কুতুবমিনারের কাছে লৌহস্তম্ভে প্রমাণিত। গুপ্ত সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের আমলে ৬০০০ কেজি ওজনের ৯৮ শতাংশ পেটা লোহা দিয়ে ৭.২১ মিটার উঁচু এই স্তম্ভটিতে আজও মরচে পড়েনি। ভারতীয় ধাতু বিজ্ঞান এমন একটি স্তরে পৌঁছেছিল যখন লোহার সঙ্গে ফসফরাসের আধিক্য বাড়িয়ে আধুনিক ফোর্জ ওয়েল্ডিঙের কৌশল তৎকালেই অবলম্বন করে এটি বানানো হয়েছিল! তখনকার ধাতু বিজ্ঞানীদের জানা ছিল ফোর্জ ঢালাই পদ্ধতি দ্বারা লোহাতে অতিরিক্ত ফসফরাস সংরক্ষিত করা সম্ভব! এই পদ্ধতিতেও ধাতুকে গরম করে পিটিয়ে বা চাপ দিয়ে আকার দেওয়া হয়। এতে ধাতুর শক্তি বেশি হয়। পশ্চিমি জগৎ এখনও পর্যন্ত এমন লোহা তৈরি করতে পারেনি।

শব্দবিজ্ঞানেও সনাতনী ঋষিদের যে অনায়াস সাফল্য এসেছিল তার প্রমাণ হিসেবে আমরা দেখতে পাই ন্যায়, বৈশেষিক ও মীমাংসাদর্শনে। ঋষি অক্ষপাদ গৌতম, কণাদ ও জৈমিনি শব্দবিজ্ঞান নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন এই গ্রন্থগুলিতে।

এমনকী, বর্তমানের quantum physics-এর ধারণা আমরা প্রাচীন বৈদিক ঋষি বা যোগীদের বর্ণিত Teleportation-এর সঙ্গে মিলে যেতে দেখি। হাজার বছর আগে উপনিষদ বলেছিল যা দেখা যায়, তা আসল নয়, যা দেখা যায় না তাই-ই আসল। Quantum physics-এর অনিশ্চয় বা এক সঙ্গে দুটো বাস্তবতার অস্তিত্বের ধারণা সনাতনী ভারতে নতুন কিছু নয়। সমগ্র বিশ্বই ব্রহ্মের প্রকাশ! অর্থাৎ আমরা যাকে পৃথক পৃথক দেখি, আসলে তা এক অভিন্ন চেতনার রূপান্তর।

দীর্ঘকাল ব্যাপী গবেষণা, নিবিড় অনুসন্ধান ও ব্যাপক পর্যবেক্ষণ এবং ফলিত দিকগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার ভারতীয় বিজ্ঞান সাধনাকে আস্তে আস্তে যে ভূমায়, যে ক্রমোন্নতির শিখরে পৌঁছে দিয়েছিল তা এক কথায় অনস্বীকার্য। সনাতনী ঋষিদের জ্ঞান পিপাসা, তাঁদের আত্মত্যাগ প্রমাণ করে প্রাচীন ভারত কোনোদিনই বিজ্ঞান চর্চায় পরান্মুখ ছিল না। একথা একমাত্র তারাই বলবেন যারা নিজেদের শিকড় হারিয়ে ফেলেছেন। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান যখন সবে পথচলা শুরু করেছে ততদিনে ভারতমাতা পেয়ে গেছেন তাঁর স্বনামধন্য গবেষক ঋষি সন্তানদের।

(সমাপ্ত)

শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারের কাছে রাজ্যবাসীর চাহিদা

গৌতম কুমার মণ্ডল

এ রাজ্যে নতুন সরকার গঠন হয়েছে। ১৫ বছরের দুর্বৃত্তায়নের পর এই নতুন সরকারকে পেয়ে মানুষ যেন মুক্তির খোলা হাওয়ায় শ্বাস নিতে পারছে। মানুষের অনেক আশা, অনেক ভরসা এই সরকারের কাছে। পুরাতন সরকারকে বিদায় দেওয়ার জন্য দেশের নানা প্রান্তে কর্মরত বাঙ্গালিও দলে দলে এখানে ভোট দিতে এসেছিলেন। ভোট দিয়ে তাঁরা আবার কর্মস্থলে ফিরে গিয়েছেন। শুধু এক একটি ভোট দিতে আসার জন্য তাঁদের খরচ হয়েছে অনেক, ছুটি নিতে হয়েছে, সময় গেছে অনেক। তবুও তাঁরা এসেছিলেন অপশাসনকে বিদায় জানানার জন্য। একটি সরকার জনগণের মনে কতখানি ঘৃণা ও অশ্রদ্ধা সৃষ্টি করলে মানুষ এভাবে ভোট দিতে আসতে পারেন ভাবতে অবাক লাগে। এখানকার আপামর জনসাধারণ দলে দলে বেরিয়ে এসে নির্ভয়ে ভোট দিলেন আর আগের সরকারকে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। নবগঠিত সরকারের মুখ্যমন্ত্রী শপথ নিলেন। সরকার কাজও শুরু করে দিয়েছে। এই নতুন সরকারের কাছে মানুষের অনেক অনেক প্রত্যাশা। এই নিবন্ধে শুধু শিক্ষা ক্ষেত্রে মানুষের প্রত্যাশার কথা উল্লেখ করা হলো।

শিক্ষা যে কোনো দেশ বা জাতির মেরুদণ্ড। অশিক্ষিত বা অর্ধ শিক্ষিত জনসাধারণ জাতির বোঝা হয়ে দেখা দেয়। অন্যদিকে শিক্ষিত জনসমাজ দেশের উন্নতিকে ত্বরান্বিত করে। এই জন্যই যে কোনো সরকারের অন্যতম প্রধান কাজ হলো দেশে সুশিক্ষার বিস্তার। শিক্ষা হবে একইসঙ্গে ঐতিহ্যবাহী ও আধুনিক, বিজ্ঞানসম্মত, মুক্তচিন্তার প্রসারক। কবিগুরুর ভাষায় 'জ্ঞান যেথা মুক্ত'।

নতুন সরকারের কাছে শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষানুরাগী মানুষের চাহিদাগুলি এরকম :

(১) যে বিরাট ব্যাধি বিগত সরকার শিক্ষাক্ষেত্রে রেখে গিয়েছে তা হলো শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি। প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত এই দুর্নীতির অবাধ বিস্তার। ভাবতে অবাক লাগে এই দুর্নীতির কারণে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ২৬ হাজার শিক্ষকের চাকরি গেছে। ভূভারতে কোনোদিন এরকম ঘটনা ঘটেনি। লাগামছাড়া দুর্নীতি এবং এ বিষয়ে বহু মামলার জন্য শিক্ষক নিয়োগ হয়নি। ফলে স্কুলে স্কুলে শিক্ষকতার বহু পদ ফাঁকা পড়ে আছে। অনেক শিক্ষক আবার ট্রান্সফার নিয়ে শহরমুখী হয়েছেন। ফলে বিশেষ করে গ্রামের স্কুলগুলি আজ শিক্ষক-শূন্যতায় ভুগছে। গ্রাম-মফস্সল-শহরের এক সময়ের নামি স্কুলগুলিতে বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিভাগ প্রায় উঠে যেতে বসেছে। এতে ছাত্র-ছাত্রীদের সমূহ ক্ষতি হচ্ছে। ক্ষতি হচ্ছে দেশের। নতুন সরকারকে এই বিষয়টির শক্ত হাতে মোকাবিলা করতে হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতিকে সমূলে উৎপাটন করতে হবে। মানুষের আশা, স্কুল সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষা, ফল প্রকাশ এবং নিয়োগ সময় বেঁধে এবং সম্পূর্ণ স্বচ্ছতার সঙ্গেই হবে। বছর বছর এসএসসি পরীক্ষা হবে এবং যোগ্য ছেলে-মেয়েরা স্কুল শিক্ষকের চাকরি পাবেন। এই সরল দাবি এ রাজ্যের শিক্ষিত যুবসমাজের, তাদের অভিভাবকদের।

(২) মানুষের প্রত্যাশা, স্কুল সার্ভিস কমিশনের আঞ্চলিক দপ্তরগুলি এরপর থেকে কার্যকর হবে। যেগুলো এখন ভুতড়ে ঘর হয়ে গেছে। অথচ প্রতিটি আঞ্চলিক দপ্তরে একজন করে চেয়ারম্যান আছেন। তিনি বেতন-সহ নানা সুবিধা পান। কিন্তু তাঁর কী কাজ তিনি নিজেই জানেন না। দু-একজন আঞ্চলিক চেয়ারম্যানও অবশ্য চুরির দায়ে জেলে আছেন। আশা করা যাচ্ছে নতুন সরকার সব কিছুকেই কলকাতা- কেন্দ্রিক করবে না। মনে রাখা দরকার, এই নবগঠিত সরকার কলকাতার বিশেষ করে দক্ষিণ কলকাতার সরকার নয়, এই সরকার গঠন করেছে সারা রাজ্যের মানুষ।

(৩) আশা করা যায়, নতুন সরকার দুর্নীতির সঙ্গে কোনোভাবেই আপোশ করবে না। দুর্নীতিগ্রস্ত যারা এ রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থাকে পুরোপুরি ভেঙে দিয়েছে তাদের আইন অনুযায়ী শাস্তি দেবে। শিক্ষাক্ষেত্রে আদালতের নির্দেশকে মান্যতা দিবে।

(৪) শুধু মাধ্যমিক শিক্ষাই নয়, প্রাথমিক শিক্ষাও বিগত সরকারের আমলে প্রায় তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ এমনকী শিক্ষকদের স্থানান্তর করতেও লক্ষ লক্ষ টাকা ঘুষ দিতে হতো। শিক্ষকেরা যদি ঘুষ দিয়ে চাকরিতে ঢোকেন তাহলে প্রথমেই তাঁদের এই উচ্চ পেশার নীতি নৈতিকতা নষ্ট হয় যায়। ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে তাঁরা সেরকমই ব্যবহার করেন। প্রাথমিক শিক্ষকদের ক্ষেত্রে পেশার সেই নৈতিকতাটিই হারিয়ে গেছে। এ একটা বড়ো বিপর্যয়। দুর্নীতির চোরাবালিতে হারিয়ে যাওয়া প্রাথমিক শিক্ষাকে উদ্ধার করা নতুন সরকারের অন্যতম দায়িত্ব।

(৫) প্রাথমিক শিক্ষকেরা বিদ্যালয়ে যান যেন পড়ানো বাদ দিয়ে অন্য সব কাজ করতে। প্রথমেই গিয়ে তাঁদের মিড ডে মিলের হাঁড়ি চড়ানোর ব্যবস্থা করতে হয়। কে রাঁধুনি, কতজন ছাত্র উপস্থিত, কী রান্না হবে এসব প্রথমেই ভাবতে হয়। মিড ডে মিলের হিসেব রাখতে হয়। প্রতিদিন বহু তথ্য এসআই-কে পাঠাতে হয়। এইসব কাজ করে সময় পেলে পড়ানো! মানুষের আশা প্রতিটি প্রাথমিক স্কুলে না হলেও কাছাকাছি তিন চারটি প্রাথমিক স্কুলের জন্য একজন করে ক্লার্ক নিয়োগ করার কথা সরকার ভাবতে পারে। এই ক্লার্ক প্রতিদিন নিজের স্কুলগুলোতে যাবেন এবং মিড ডে মিলের হিসেব রাখা-সহ পড়ানো বাদ দিয়ে বাকি কাজ করবেন। এতে শিক্ষকেরা শুধু পঠনপাঠনে মন দিতে পারবেন। এতে মিড ডে মিলের হিসেবে স্বচ্ছতা থাকবে এবং শিক্ষকদের এ বিষয়ে মাথা ঘামাতে হবে না।

(৬) প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষকদের নিয়োগ অবশ্যই নিজেদের জেলায়, সম্ভব হলে নিজেদের ব্লক এলাকার মধ্যে হবে। এতে নিজের স্কুলে যাওয়ার জন্য শিক্ষককে কয়েক

ফঃ ৫

ঘণ্টার পথ বাসে ট্রেনে যাতায়াত করতে হবে না। তিনি যাতায়াতেই যদি ক্লান্ত হয়ে পড়েন তাহলে পড়াবেন কীভাবে? শিক্ষকের মূল কাজ পাঠদান; সেটা কীভাবে প্রতিদিন ভালোভাবে হয় তা সরকারকেই ভাবতে হবে। আশা করা যায় নতুন সরকার নিশ্চয়ই তা ভাববে।

(৭) প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল শিক্ষার সিলেবাসের পুনর্মূল্যায়ন দরকার। গণিত, সাহিত্য ও সমাজ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সিলেবাসের যে ইসলামীকরণ হয়েছিল সেসব সমূলে উচ্ছেদ প্রয়োজন। এইসব ইসলামীকরণ শিশু-কিশোরদের মনকে বিষাক্ত ও সাম্প্রদায়িক করে তোলে।

(৮) স্কুল শিক্ষায় সেমেস্টার পদ্ধতি কতদূর গ্রহণযোগ্য ভেবে দেখা দরকার। এতে শুধু পরীক্ষা হচ্ছে কিন্তু পড়াশোনায় ঘাটতি থেকে যাচ্ছে বলে মনে হয়। নতুন সরকার বিষয়টি ভেবে দেখতে পারে।

(৯) বিগত সরকার স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য কিছু স্কলারশিপ চালু করেছে। আশা করা যায়, এইসব স্কলারশিপেরও পুনর্মূল্যায়ন হবে। তবে একাদশ শ্রেণীতে দেওয়া 'তরুণের স্বপ্ন' নামক প্রকল্পটি (মোবাইল ফোন কেনার জন্য দেয় দশ হাজার টাকা) অবিলম্বে বাদ দেওয়া দরকার। সাম্প্রদায়িক ভাবেও কিছু স্কলারশিপ দেওয়া হয়। সেগুলো নিয়ে নতুন সরকারকে ভাবতে হবে।

(১০) নতুন সরকারের কাছে আমাদের আশা, স্কুল শিক্ষা এবং উচ্চ শিক্ষার জন্য দুটি পৃথক দপ্তর ও দুজন পৃথক মন্ত্রী নিযুক্ত হন। বিষয় শিক্ষা হলেও এই দুটি ক্ষেত্র এবং তাদের ভাবনা আলাদা।

(১১) বিগত সরকারের আমলে উচ্চ শিক্ষার দৈন্যদশা দিনের পর দিন প্রকট হয়ে উঠেছে। এই বিষয়ে বিগত সরকারের কোনো স্পষ্ট ভাবনা ছিল না। শিক্ষামন্ত্রী শুধু মুখ্যমন্ত্রীর মুখনিঃসৃত বাণীর অপেক্ষা করতেন। সরকার কী চাইছে তার স্পষ্ট দিশা না থাকলে এরকমই হয়। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে ২০২০-র জাতীয় শিক্ষানীতি অনুসারে রাজ্য সরকারকে তার স্পষ্ট দিশা নির্দেশ ঠিক করতে হবে। তারপর সেই দিশা অনুযায়ী এগিয়ে যেতে হবে। কাজটি অবিলম্বে শুরু করা দরকার। আশা করা যাচ্ছে, নতুন সরকার এ কাজ করবে। একাজ করার জন্য বহু যোগ্য লোক এই সরকারে আছেন।

(১২) চাকরিবাকরি হচ্ছে না বলে উচ্চ শিক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীরা আগ্রহ হারিয়েছে। পড়ে কী হবে— এই প্রশ্ন যুবসমাজকে গ্রাস করেছে। শিক্ষকরা লক্ষ্য করেছেন, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি বিভাগের বহু আসন ফাঁকা থাকছে। ছেলে-মেয়েরা কলেজে ভর্তি হতে আসছে না। ফলে কলেজগুলোতে প্রতি বছর ক্রমশ ছাত্র ভর্তি কমছে। একই অবস্থা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেও প্রয়োজ্য। এ এক ভয়ঙ্কর অবস্থা। পুরুলিয়ার সিধু কানহু বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কলেজগুলিতে স্নাতক স্তরে মোট আসন প্রায় বাইশ হাজার। অথচ গত শিক্ষাবর্ষে ভর্তি হয়েছে মাত্র সাত হাজারের মতো ছাত্র-ছাত্রী। গোটা রাজ্যের পরিস্থিতি মোটামুটি একই রকম। এই ভয়ঙ্কর অবস্থা থেকে উত্তরণের পথ নতুন সরকারকে খুঁজতে হবে।

(১৩) বিগত সরকার কলেজে ভর্তির জন্য সেন্ট্রালাইজড অন লাইন পোর্টাল খুলেছিল। একাজ করতে গিয়ে পড়াশোনা বন্ধ রেখে কয়েক মাস সময় নষ্ট হয়ে যায়। উচ্চ শিক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীরা আসতে চাইছে না। তার উপর এইসব জটিলতা ছাত্র-ছাত্রীদের বিভ্রান্ত করছে। অন লাইন পোর্টাল যেন বিশ্ববিদ্যালয়-কেন্দ্রিক হয় সে বিষয়ে নতুন সরকারকে ভাবতে হবে।

(১৪) কলেজে অধ্যাপনার চাকরি এবং অধ্যক্ষদের নিয়োগ কলেজ সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে হয়। বিগত সরকারের আমলে এই ক্ষেত্রটিকেও দুর্নীতি গ্রাস করেছিল। গত কয়েক বছর ধরে যিনি কলেজ সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান তিনিই আবার আজ এই বিশ্ববিদ্যালয় তো কাল অন্য আরেকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। আর যেন যোগ্য লোক এ রাজ্যে ছিল না। বিগত সরকারের আমলে এ রাজ্যের বহু কলেজে এমন সব অধ্যক্ষ নিয়োগ হয়েছেন যাদের কলেজে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসরের যোগ্যতা নেই। আশা করা যাচ্ছে, নতুন সরকার গত পাঁচ ছয় বছরের অধ্যক্ষ নিয়োগের বিষয়গুলো খতিয়ে দেখবে।

(১৫) নতুন সরকার কলেজের অধ্যক্ষদের চাকরিকে ইউজিসি-র নিয়ম অনুযায়ী বিচার করতে হবে। এই নিয়মে অধ্যক্ষ পাঁচ বছরের জন্য নিয়োগ হবেন। পাঁচ বছর পর তিনি তাঁর পুরনো পদে ফিরে যাবেন। এই নিয়ম এ রাজ্যের কলেজগুলোতে চালু হবে বলে আশা করা যায়। এরকম হলে কলেজ প্রশাসন স্বচ্ছভাবে চলবে। আর অধ্যক্ষরা স্থায়ী হয়ে গেলে কলেজ-কেন্দ্রিক এক ধরনের মৌরুসি পাট্টা তাঁরা চালু করেন। এতে সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষতি হয়।

(১৬) নতুন সরকারের কাছে আবেদন যে, এ রাজ্যে আর নতুন বিশ্ববিদ্যালয় যেন না খোলা হয়। বিগত সরকারের মুখ্যমন্ত্রীর খেয়ালে বহু বিশ্ববিদ্যালয় খোলা হয়েছে যে সেগুলিকেই গুছিয়ে তোলা একটি বড়ো কাজ। বরং নতুন কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়তে সরকার যেন এগিয়ে আসে।

(১৭) বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও অধ্যাপক নিয়োগে ইউজিসি-র নিয়ম সম্পূর্ণরূপে মেনে চলা হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

(১৮) কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার, পরীক্ষাগার, গবেষণা সব কিছুর উন্নতির জন্য আশা করা যায় নতুন সরকার সচেষ্ট হবে।

(১৯) কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্বাচনের মাধ্যমে ছাত্র সংসদ গঠনের জন্য সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে। তবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে যে কোনোরকম দলীয় রাজনীতির বিশৃঙ্খলা থেকে বাইরে রাখতেই হবে।

(২০) স্কুল-কলেজে ছুটির সংখ্যা কমানো দরকার। গ্রীষ্মের ছুটি কমিয়ে কিছুদিন মর্নিং স্কুল চালানোর কথা সরকার ভাবতে পারে। পূজাতেও একমাস ছুটি দেওয়ার কোনো দরকার নেই। স্কুল-কলেজে পঠনপাঠনের দিন বাড়ানো দরকার।

নতুন সরকারের কাছে রাজ্যের শিক্ষানুরাগী মানুষের এই কয়েকটি আশা। নতুন সরকার রাজ্যের ভেঙে পড়া শিক্ষা ব্যবস্থাকে শোধরানোর জন্য আশা করা যায় নিরন্তর কাজ করবে। বহু যোগ্য মানুষ এই সরকারে আছেন। তাঁদের কাছে সদর্থক পদক্ষেপ আশা করা যেতেই পারে। □

কবি নজরুলের কালীভক্তি, শ্যামাসঙ্গীত ও বিদ্রোহী চেতনার অন্তর্লোক

সৌম্যব্রত দাশগুপ্ত

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এমন কিছু ব্যক্তিত্ব আছেন, যাঁরা কেবল সাহিত্যিক নন— একটি যুগের প্রতীক। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম সেই বিরল মহত্ত্বের অন্যতম উজ্জ্বল নাম। তিনি শুধু কবি ছিলেন না; ছিলেন প্রতিবাদের আগুন, সাম্যের কণ্ঠস্বর, নিপীড়িত মানুষের ভাষা এবং একই সঙ্গে প্রেম, ভক্তি ও মানবতার এক অনন্য সাধক। তাঁর কলম যেমন অত্যাচারের বিরুদ্ধে বজ্রনিনাদ করেছে, তেমনি তাঁর হৃদয় গভীর ভক্তিতে নত হয়েছে মা কালীর চরণে। এই দুই বিপরীত স্রোতের অপূর্ব মিলনই নজরুলকে করেছে ব্যতিক্রমী।

কবি নজরুলের সাহিত্যজীবন এমন এক সময়ে বিকশিত হয়েছিল, যখন ভারতবর্ষ ছিল রাজনৈতিক অস্থিরতা, ঔপনিবেশিক শোষণ এবং সাম্প্রদায়িক বিভাজনের আগুনে জর্জরিত। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন, বিশ্বযুদ্ধের বিভীষিকা এবং সমাজের অসাম্য তাঁর মননকে গভীরভাবে আলোড়িত করেছিল। তাই তাঁর কবিতা ও গান কেবল শিল্পের প্রকাশ ছিল না, ছিল সংগ্রামের

> ‘কবি নজরুলের কালীভক্তি কোনো সাম্প্রদায়িক পরিচয়ের সীমায় আবদ্ধ নয়— এটি মূলত মানবমুক্তি, শক্তি ও চিরন্তন সৌন্দর্যের আরাধনা। তাই শত বিতর্ক, সমালোচনা কিংবা নিষেধাজ্ঞা পেরিয়ে তাঁর শ্যামাসঙ্গীত আজও বাঙ্গালির মাটি, মানুষ ও সংস্কৃতির অন্তরে গভীরভাবে বেঁচে রয়েছে।’

অস্ত্র। ‘বিদ্রোহী’, ‘ধূমকেতু’, ‘আনন্দময়ীর আগমনে’— এসব রচনার মধ্যে তিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে এক দুর্বার আহ্বান উচ্চারণ করেছিলেন। তাঁর ভাষা ছিল অগ্নিময়, অথচ হৃদয় ছিল গভীর মানবিকতায় পূর্ণ।

তবে কবি নজরুলকে নিয়ে সবচেয়ে বেশি বিতর্ক তৈরি হয়েছিল তাঁর ধর্মীয় ভাবনা এবং শ্যামাসঙ্গীত রচনাকে ঘিরে। মুসলমান পরিবারে জন্ম নেওয়া একজন কবি যখন কালীসাধনা, শাক্তদর্শন এবং শ্যামাসঙ্গীতে আত্মনিবেদন করেন, তখন মুসলমান সম্প্রদায়ের কট্টরপন্থী অংশ তাঁকে সহজভাবে মেনে নিতে পারেনি। একদল মুসলমান তাঁকে ‘কাফির’ আখ্যা দিয়েছিল, আবার একাংশ হিন্দু তাঁকে ‘বিজাতি’ বলে দূরে সরিয়ে রাখতে চেয়েছিল। কিন্তু কবি নজরুল ছিলেন সমস্ত সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে। তিনি বিশ্বাস করতেন, উপাসনা পদ্ধতি মানুষের বিভাজনের জন্য নয়; বরং মানবমুক্তির পথ।

এই কারণেই তাঁর রচনায় একদিকে যেমন ইসলামি সুর, হামদ-নাত ও গজল দেখা যায়, অন্যদিকে তেমনি শ্যামাসঙ্গীত, কীর্তন, ভজন ও শাক্ত পদাবলীর অপূর্ব সমাহারও লক্ষ্য করা যায়। তিনি ছিলেন প্রকৃত অর্থেই অসাম্প্রদায়িক চেতনার

কবি।

কবি নজরুলের শ্যামাসঙ্গীতের মূল উৎস ছিল তাঁর শাক্তদর্শনের প্রতি আকর্ষণ। শাক্ত পরম্পরা মূলত শক্তির উপাসনা— যেখানে নারীজাতিকে পরম সত্তা হিসেবে কল্পনা করা হয়। দেবী কালী এখানে শুধু ধ্বংসের প্রতীক নন— তিনি সৃষ্টি, শক্তি, জাগরণ ও মুক্তির প্রতীক। ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত ভারতবর্ষে এই শক্তিচেতনা কবি নজরুলকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। তিনি দেবী কালীর মধ্যে দেখেছিলেন অত্যাচার ধ্বংসকারী এক মহাশক্তির রূপ।

তাই তাঁর রচিত ও সুরারোপিত শ্যামাসঙ্গীতে শুধুই ভক্তির সুর নেই; রয়েছে বিদ্রোহ, আর্তি, আত্মসমর্পণ ও মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। তিনি 'মা'কে কখনো আদরের জননী হিসেবে দেখেছেন, কখনো সর্বনাশী রণরঙ্গিণী রূপে কল্পনা করেছেন। তাঁর ভাষায়—

'আর কতকাল থাকবি বেটী মাটির ঢেলার মূর্তি আড়াল? স্বর্গ যে আজ জয় করেছে অত্যাচারী শক্তি চাঁড়াল।'

এই আহ্বান কেবল ধর্মীয় স্তোত্র নয়; এটি নিপীড়িত জাতির মুক্তির আহ্বান।

কবি নজরুলের শ্যামাসঙ্গীতের সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য হলো তাঁর আবেগের গভীরতা। তাঁর গানগুলোয় ব্যক্তিগত আর্তি, মাতৃস্নেহের আকুলতা এবং আধ্যাত্মিক আত্মসমর্পণ একাকার হয়ে গেছে। তিনি মা কালীর কাছে কেবল পূজা নিবেদন করেননি, নিজের সমস্ত বেদনা ও ব্যর্থতাও সমর্পণ করেছেন। তাঁর গানে মায়ের প্রতি এক শিশুসুলভ নির্ভরতা দেখা যায়;

'মার হাতে কালি, মুখে কালি, মা আমার কালিমাখা।'

এই সরল উচ্চারণের মধ্যেই রয়েছে গভীর ভক্তি এবং অন্তরের অকৃত্রিম টান। কবি নজরুলের কণ্ঠে মা শ্যামা যেন কোনো পৌরাণিক দেবী নন; তিনি হয়ে ওঠেন বাঙ্গালির ঘরের মা।

শ্যামাসঙ্গীতের ইতিহাসে সাধক কবি রামপ্রসাদ সেন ও কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য এক বিশেষ ধারা নির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে সেই ধারাকে আধুনিকতা, সুরবৈচিত্র্য এবং বিপ্লবী চেতনার সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন বিদ্রোহী কবি নজরুল। তিনি শ্যামাসঙ্গীতকে কেবল মন্দির বা পূজার গণ্ডিতে আটকে রাখেননি; বরং সাধারণ মানুষের হৃদয়ের ভাষায় রূপ দিয়েছিলেন।

কবি নজরুলের সৃষ্টিশীলতার বিস্তার ছিল অবিশ্বাস্য। তিনি প্রায় চার হাজার গান রচনা করেন এবং অধিকাংশ গানের সুরও নিজেই দিয়েছেন। তাঁর সৃষ্টিগুলো আজ 'নজরুলগীতি' নামে বাংলা সংগীতের এক অমূল্য সম্পদ। এর একটি বিশাল অংশ জুড়ে রয়েছে শ্যামাসঙ্গীত। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'রাঙা-জবা' শাক্তসঙ্গীতের এক অনন্য ভাণ্ডার। এই গানের প্রতিটি পঙ্‌ক্তিতে ফুটে উঠেছে তাঁর অন্তর্লীন ভক্তি, যন্ত্রণা ও শক্তির আরাধনা।

নারীজাতির প্রতি কবি নজরুলের শ্রদ্ধা শুধু ধর্মীয় অনুভূতিতে সীমাবদ্ধ ছিল না। তাঁর সাহিত্যজুড়ে নারীকে তিনি শক্তি, প্রেম, জাগরণ ও মুক্তির প্রতীক হিসেবে তুলে ধরেছেন। সমাজে নারীর অবমাননা তাঁকে ব্যথিত করত। তাই তাঁর কালীভাবনা মূলত নারীশক্তিরই এক মহিমান্বিত রূপায়ণ।

অন্যদিকে, নজরুলের শ্যামাসঙ্গীতকে ঘিরে যে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছিল, সেটিও বঙ্গ সংস্কৃতির ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ। পাকিস্তান আমলে পূর্ববঙ্গের বেতারে তাঁর শ্যামাসঙ্গীত সম্প্রচার পর্যন্ত নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। কারণ, মজহবি সংকীর্ণতা তাঁর অসাম্প্রদায়িক সৃষ্টিকে মেনে নিতে পারেনি। কিন্তু সময় প্রমাণ করেছে— কবি নজরুল কোনো একটি উপাসনা পদ্ধতি বা সম্প্রদায়ের কবি নন; তিনি সমগ্র বাঙ্গালি জাতিসত্তার কবি।

আজও দুর্গাপূজা, কালীপূজা কিংবা শ্যামাপূজার মণ্ডপে কবি নজরুলের গান অনিবার্য হয়ে ওঠে। একইভাবে তাঁর অন্যান্য গানও সমান জনপ্রিয়। এই বিরল সামঞ্জস্যই তাঁকে বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে মানবিক ও সর্বজনীন শিল্পীতে পরিণত করেছে।

কবি নজরুলের শ্যামাসঙ্গীতের আরেকটি বিশেষ দিক হলো এর কাব্যিক সৌন্দর্য। তাঁর ভাষা কখনো তীব্র, কখনো কোমল; কখনো বজ্রের মতো কঠিন, কখনো শিশুর কান্নার মতো সরল। তিনি ভক্তিকে কেবল আধ্যাত্মিকতায় সীমাবদ্ধ রাখেননি; মানুষের বাস্তব জীবনসংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন। তাঁর গান তাই আজও শ্রোতার হৃদয়ে সমানভাবে অনুরণিত হয়।

বর্তমান সময়ে যখন সাম্প্রদায়িক বিভাজন, মজহবি অসহিষ্ণুতা ও জেহাদি সন্ত্রাস সমাজকে বারবার অস্থির করে তোলে, তখন কবি নজরুলের শ্যামাসঙ্গীত নতুন করে সকলকে ভাবায়। তিনি দেখিয়েছেন, প্রকৃত ভক্তি কখনো বিভেদ সৃষ্টি করে না; বরং মানুষকে আরও মানবিক ও উদার করে তোলে। তাঁর শ্যামাসঙ্গীত ছিল বিদ্রোহের শক্তি অর্জনের এক আধ্যাত্মিক পথ।

বাংলা সাহিত্য ও সংগীত জগতে কবি নজরুল তাই এক অনন্য বিস্ময়। তিনি যেমন বিদ্রোহের কবি, তেমনি ভক্তির কবিও। তাঁর শ্যামাসঙ্গীতের মধ্যে যেমন মাতৃস্নেহের আকুতি আছে, তেমনি আছে অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ডাক। এই দ্বৈত সত্তার কারণেই তাঁর সৃষ্টি আজও কালজয়ী।

কবি নজরুলের কালীভক্তি কোনো সাম্প্রদায়িক পরিচয়ের সীমায় আবদ্ধ নয়— এটি মূলত মানবমুক্তি, শক্তি ও চিরন্তন সৌন্দর্যের আরাধনা। তাই শত বিতর্ক, সমালোচনা কিংবা নিষেধাজ্ঞা পেরিয়ে তাঁর শ্যামাসঙ্গীত আজও বাঙ্গালির মাটি, মানুষ ও সংস্কৃতির অন্তরে গভীরভাবে বেঁচে রয়েছে। □

২০২৬-এর পরিবেশ বার্তা : পরিবেশ রক্ষার দ্রুত পদক্ষেপ

সঞ্জিত কুমার সাহা

১৯৭২ সালে জাতিসঙ্ঘে 'মানব পরিবেশ' বিষয়ে যে ঐতিহাসিক আলোচনা হয় তারই প্রেক্ষিতে বিশ্ববাসীকে পরিবেশ সুরক্ষার জন্য এবং পরিবেশগত সমস্যা মোকাবিলায় সচেতনতা বৃদ্ধি, নীতিগত পরিবর্তন এবং উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের উদ্দেশ্যে কয়েক দশক ধরে বিশ্বব্যাপী প্রতি বছর ৫ জুন দিনটিকে 'বিশ্ব পরিবেশ দিবস' হিসেবে পালন করা হয়ে আসছে। পরিবেশ রক্ষার জন্য প্রতি বছরে একটি বিশেষ বার্তা বিশ্ববাসীকে দেওয়া হয়। উদ্দেশ্য একই দিনে পৃথিবীর সকল মানুষ যেন একই বিষয়ে সচেতন হয়ে প্রত্যেকে যথাযথ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে পারে। এদিকে লক্ষ্য রেখেই 'জলবায়ুর পরিবর্তন', 'সমুদ্র ও বাস্তুতন্ত্রের ব্যবস্থাপনা', 'সবুজ অর্থনীতি', 'একটাই পৃথিবী', 'আমাদের পৃথিবী আমাদের ভবিষ্যৎ', 'জীবনের জন্য জল', 'ওজন স্তর', 'ভূমিক্ষয়', 'সুস্থায়ী উন্নয়ন', 'জনসংখ্যা ও পরিবেশ, 'বিশ্ব-উষ্ণায়ন', 'বর্জ্য-ব্যবস্থাপনা' 'হিমবাহর গলন', 'প্লাস্টিক দূষণ', 'অরণ্য সৃজন', 'পরিবেশগত অবক্ষয়', 'জীববৈচিত্র্যের সুরক্ষা' ইত্যাদি বিষয়ে এক বা একাধিকবার বার্তা দেওয়া হয়েছে।

এ বছরের মুখ্য বার্তা হলো জলবায়ু রক্ষার দ্রুত পদক্ষেপ। কারণ পৃথিবী ক্রমশ উষ্ণ হচ্ছে, হিমবাহ গলছে, দাবানলে পুড়ে যাচ্ছে অরণ্য, অনাবৃষ্টিতে শুকিয়ে যাচ্ছে নদী ও জলাশয়। আবার কোথাও আকস্মিক বন্যা গ্রাস করছে জনপদ। এর সঙ্গে বাড়ছে সমুদ্রের জলস্তর। সেজন্য আওয়াজ উঠেছে 'Now for Climate'। এটি শুধু স্লোগান নয়, সমগ্র মানবসভ্যতার অস্তিত্ব রক্ষার আহ্বান। মানুষ যদি এখনও সচেতন না হয়, তবে অদূরে অপেক্ষা করছে ভয়াবহ বিপদ। অচিরেই শুকিয়ে যাবে নদী, উধাও হবে বন। ঋতুবৈচিত্র্য চিরতরে হারিয়ে যাবে।

একথা অনস্বীকার্য মানুষের পথ চলাই শুরু হয়েছে নদী, পাহাড়, অরণ্য জীবনের মধ্যে দিয়ে। কিন্তু মানবসভ্যতার বিকাশের সঙ্গে বিনষ্ট হয়েছে প্রকৃতির ভারসাম্য। শিল্পকারখানার ধোঁয়া, জীবাশ্ম- জ্বালানির অতিরিক্ত ব্যবহার, নির্বিচারে বনধ্বংস, প্লাস্টিক-দূষণ ইত্যাদির কারণে দ্রুত তাপ বাড়ছে। পৃথিবীর গড় তাপমাত্রাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই কারণেই আজ 'উষ্ণায়ন' সকলেরই জানা। জলবায়ু পরিবর্তনেরও প্রধান কারণ উষ্ণায়ন।

গত কয়েক বছরে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে জলবায়ু বিপর্যয়ের অসংখ্য উদাহরণ দেখা গেছে। কোথাও প্রবল ঘূর্ণিঝড়, কোথাও দীর্ঘ খরা, আবার কোথাও অস্বাভাবিক তাপপ্রবাহ মানুষের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছে। ভারতও এই সংকট থেকে মুক্ত নয়। হিমালয়ের হিমবাহ দ্রুত গলছে, পশ্চিমাঞ্চলে জলসংকট বাড়ছে, উপকূল-অঞ্চলে সমুদ্রের জলস্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গেও ঘূর্ণিঝড়, অতিবৃষ্টি ও নদীভাঙনের ঘটনা আগের তুলনায় বেড়েছে। সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ এলাকা লবণাক্ততার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। প্রকৃতির এই পরিবর্তন শুধু পরিবেশের ক্ষতি করছে না, মানুষের খাদ্য, স্বাস্থ্য ও জীবিকাও বিপন্ন হয়ে উঠছে। গত বছরে (২০২৫) ইউরোপে দীর্ঘস্থায়ী তাপপ্রবাহে হাজার হাজার মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। ইন্দোনেশিয়া, শ্রীলঙ্কা ও মালয়েশিয়ায় ঘূর্ণিঝড় ও প্রবল বৃষ্টিতে হাজার হাজার বিপন্ন মানুষের অসহায়তার খবর অনেকেই জানেন। আবহাওয়াবিদদের মতে, ২০২৫ সালের দীর্ঘস্থায়ী দাবদাহে ভারত ও পাকিস্তান বিপর্যস্ত হয়েছিল বেশি। কোথাও কোথাও তাপমাত্রা ৪৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসেও পৌঁছেছিল। শুধু তাপপ্রবাহ নয়, বৃষ্টি, বন্যা, ধূলিঝড়েও ভারতের একাংশে দুর্যোগ নেমে এসেছিল। দুর্যোগ থেকে রেহাই পায়নি পশ্চিমবঙ্গও। ঘূর্ণিঝড়, অস্বাভাবিক বর্ষণ, নদীভাঙন, সুন্দরবন-অঞ্চলে সমুদ্রের জলস্তর বৃদ্ধি ও লবণাক্ততার কারণে কৃষি ও জীববৈচিত্র্য মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। উপকূলবর্তী এলাকায় ঘূর্ণিঝড়ের আশঙ্কা প্রতি বছরই বেড়ে চলেছে। দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় অতিবৃষ্টির ফলে জলাবদ্ধতা ও ফসলহানির ঘটনা ঘটেছে। আবার উত্তরবঙ্গে পাহাড়ি এলাকায় ভূমিধস ও বন্যা মানুষের জীবনকে বিপন্ন করেছে। পরিবেশবিদের মতে প্রকৃতিকে নির্মমভাবে শোষণের ফল এটা। তাঁদের মতে, এই সব দুর্যোগ কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এগুলি সবই জলবায়ু পরিবর্তনেরই বহিঃপ্রকাশ।

এই পরিস্থিতিতে এবারের পরিবেশ দিবসের ভাবনার প্রতিফলন শুধু কিছু সভা, আলোচনা, গাছ-লাগানো নয়, দরকার প্রতিটি মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সচেতন পদক্ষেপ। তবেই এর সার্থকতা। বিদ্যুতের অপচয় বন্ধ করা, প্লাস্টিকের প্যাকেটের পরিবর্তে চট কিংবা কাপড়ের থলে ব্যবহার, জল-সংরক্ষণ করা, প্রচুর পরিমাণে গাছ লাগিয়ে, গাছ বাঁচানো দরকার বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মকে পরিবেশ বিষয়ে সচেতন হতে হবে। বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ে পরিবেশ-শিক্ষার প্রসার ঘটানোর পাশাপাশি প্রকৃতিকে ভালোবাসার মন্ত্র শেখাতে হবে। গাছকে বন্ধু মনে করতে হবে।

পরিবেশ-রক্ষায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে হবে। সৌরশক্তি, বায়ুশক্তি ও অন্যান্য নবীকরণযোগ্য শক্তির ব্যবহার বাড়াতে হবে। দূষণ কমাতে শিল্পকারখানায় কঠোর নিয়ম প্রয়োগ জরুরি। পৃথিবী শুধু মানুষের নয়। পশুপাখি, গাছপালা, নদী-পাহাড়— সব মিলিয়েই পৃথিবী। পৃথিবী সকলের জন্য।

সময় চলে যাচ্ছে। প্রকৃতি এখন তীব্র হুমকির মুখে। আমাদের চারপাশে সংকট। এর হাত থেকে মুক্তি পেতে প্রথম দরকার আমাদের আচরণে বদল ঘটিয়ে পরিবেশবান্ধব জীবনচর্যার।

(বিশ্বপরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে প্রকাশিত)

সাহায্যের হাত

রাহুল দুপুরের খাবার খেয়ে ঘরে বসেছিল পুবদিকের জানালাটা খুলে। বাইরে উত্তপ্ত আবহাওয়া, তবু রাহুল জানালা খুলে বসে আছে। হাওয়া খাওয়া তার উদ্দেশ্য নয়; উদ্দেশ্য ছিল বাইরের উত্তপ্ত আবহাওয়ায় পশুপাখিরা কী করছে তা দেখার।

রাহুল জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে। হঠাৎ তার চোখ পড়ল পাশের বাড়ির ছাদের দিকে। ওই বাড়ির বৃদ্ধ লোকটি পায়ের ওপর পা তুলে একটি চেয়ারে বসে আছেন। তাঁর মাথার ওপর একটা কাঠের ছাতার মতো থাকায় তিনি বেশ আরামেই বসে আছেন। হঠাৎ একটি চড়ুইপাখি

উড়ে এসে ওই বৃদ্ধের সামনে রাখা বিরাট টেবিলটায় বসল। মনে হয় পাখিটা এই গরমে তৃষ্ণার্ত হয়ে টেবিলের ওপর এসে বসেছে। কিন্তু কে জানে যে এতে বৃদ্ধ এত বিরক্ত হবেন।

এরপরে যা ঘটল সেটাই হলো রাহুলের কাছে খুবই দুঃখের। বৃদ্ধ তাঁর পাশে পড়ে থাকা একটি পাথরের টুকরো ছুঁড়ে মারলেন পাখিটার দিকে। রাহুল বুঝতেই পারল না, বৃদ্ধ পাখিটার ওপর কেন অকারণ রেগে গেলেন। পাথরের টুকরোটি পাখিটার পায়ে গিয়ে লাগলেও পাখিটা কোনোমতে উড়ে এসে বসল রাহুলের বসে থাকা জানালায়। রাহুল পাখিটার মাথায় হাত বুলিয়ে দিল। পাখিটা একটুও ভয় পেল না। কিন্তু থরথর করে কাঁপছে। বৃদ্ধের ওপর রাহুলের ভীষণ রাগ হলো।

পাখিটার ওপর রাহুলের খুব মায়া হলো। রাহুল পাখিটাকে হাতে তুলে নিল। তারপর পায়ের ক্ষতস্থানে মলম লাগিয়ে দিল। বিস্কুটের টুকরো ও জল খেতে দিল। একটু পরে পাখিটা ওর দিকে তাকিয়ে জানালা দিয়ে উড়ে চলে গেল। পাখিটাকে একটু সাহায্য করতে পেরেছে বলে রাহুলের মনটা খুব ভালো হয়ে গেল। কিন্তু ওই বৃদ্ধের ব্যবহারটা তার একদম ভালো লাগল না।

এই ঘটনার পর পাঁচদিন পেরিয়ে গেছে। রাহুল লক্ষ্য করেছে, ওই পাখিটার সঙ্গে আরও দুটো চড়ুই রোজ রাহুলের পুবদিকের জানালায় এসে বসে আর রাহুলের দিকে তাকিয়ে একটু কিচ কিচ শব্দ করতে থাকে। রাহুল জল আর বিস্কুটের টুকরো খেতে দেয়। তারপর তারা উড়ে চলে যায়।

পাখিটাকে সেদিন একটু সাহায্য করার পর থেকে রাহুলের মনটি খুব আনন্দে রয়েছে। সেদিন থেকে রাহুল রোজ ওই জানালায় পাখিদের জন্য খাবার ও জল রেখে দেয়। সারা দিনে অনেক পাখি ওই জল ও খাবার খেয়ে যায়। এই গরমে পাখিদের একটু সাহায্য করতে পেরে সারাদিন রাহুলের মন খুশিতে ভরে থাকে।

ছোটো বন্ধুরা, রাহুলের কাছ থেকে শিক্ষা নিয়ে আমরাও এই গরমে প্রতিদিন জল আর খাবার দিয়ে পাখিদের একটু সাহায্য করতে পারি। আমরা গাছেদেরও এভাবে জল দিয়ে সাহায্য করতে পারি। এতে গাছ ও পাখিরা বেঁচে থাকবে আর আমাদের মনও আনন্দে থাকবে। গাছ তো আমাদের প্রাণবায়ু দেয় আর পাখিরা পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখে।

সপ্তর্ষি রায়, সপ্তমশ্রেণী, লেকটাউন, কল-৪৮

জাতীয় উদ্যান

বান্ধবগড়

বান্ধবগড় জাতীয় উদ্যান মধ্যপ্রদেশের উমারিয়া জেলায় অবস্থিত। এর আয়তন ১০৫ বর্গকিলোমিটার। ১৯৬৮ সালে এটিকে জাতীয় উদ্যান ঘোষণা করা হয় এবং ১৯৯৩ সালে টাইগার রিজার্ভ হয়ে ওঠে। এই উদ্যানের তিনটি প্রধান ক্ষেত্র হলো তালা, মাগধী ও খিতৌলি। জীববৈচিত্র্যের দিক থেকে তালা হলো সবচেয়ে সমৃদ্ধ এলাকা। এখানে অনেক বাঘ দেখতে পাওয়া যায়। এই উদ্যানে ৩৭ প্রজাতির স্তন্যপায়ী জীব, ২৫০ প্রজাতির পাখি, ৮০ প্রজাতির প্রজাপতি এবং বেশ কয়েক প্রজাতির সরীসৃপ রয়েছে। এই উদ্যান ভ্রমণের সেরা সময় অক্টোবর থেকে জুন মাস পর্যন্ত। বর্ষাকালে (জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর) বন্ধ থাকে। উদ্যানের ভেতরে আকর্ষণীয় দ্রষ্টব্য হলো বান্ধবগড় দুর্গ।

এসো সংস্কৃত শিখি-১১৫

ভুতকাল– পুংলিঙ্গে (ভাগ : ১)

(অতীতকাল– পুংলিঙ্গে)

গতবান – গিয়েছিল।

গচ্ছতি –গতবান। (যায় -- গিয়েছিল)

আগচ্ছতি – আগতবান্।

পঠতি – পঠিতবান্।

লিখতি – লিখিতবান্।

বালকঃ গতবান্। দীপঙ্করঃ গতবান্।

সঃ গতবান্।

এষঃ গতবান্। ভবান গতবান্। অহং গতবান্।

এরকম পুংলিঙ্গে **সঃ, এষঃ, কঃ, ভবান্, অহম্** দিয়ে অন্য ক্রিয়াপদ সহযোগে এক-একটি বাক্য রচনা করতে হবে। যেমন **গতবান** দিয়ে বাক্য রচনা করা আছে, সেরকম **লিখিতবান্, খাদিতবান্, দত্তবান্** দিয়েও বাক্য রচনা করতে হবে।

ভালো কথা

বকের ছানা

এবার গরমের ছুটিতে আমি বাঁকুড়া জেলার খাতড়াতে মামার বাড়ি এসেছি। এখানে একটি দৃশ্য আমার খুবই ভালো লেগেছে। এখানে পুলিশ-থানার ভেতরের বড়ো বড়ো গাছগুলিতে নানা জাতের বক, পানকৌড়ি, সারস বাসা করেছে। সব বাসায় একটি-দুটো ছানা রয়েছে। ছানাগুলির চিৎকারে জায়গাটি মুখরিত। সারাদিন ওদের মা-বাবা ছোটো-বড়ো নানা জাতের মাছ খেয়ে নিয়ে সেগুলো উগরে ছানাদের খাইয়ে দিচ্ছে। গাছের তলায় অনেক মাছ যেমন পড়ে রয়েছে, তেমনই অনেক ছানাও বাসা থেকে পড়ে গিয়েছে। তবু ওদের মায়েরা মাটিতে এসে ছানাদের খাইয়ে দিচ্ছে। একজন পুলিশকাকু বললেন তাঁরা ওদের উপর সবসময় নজর রাখেন, যাতে কেউ এদের বিরক্ত না করে। প্রতিদিন কিছু সময় দাঁড়িয়ে এসব দেখতে আমার খুব ভালো লাগে।

নন্দিনী বিশ্বাস, অষ্টমশ্রেণী, চাকদহ, নদীয়া

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে

(১) র দা কু দা

(২) শ ন্দ দে না

সঠিক ভাবে সাজাতে হবে

(১) হা র ব্য অ ব প

(২) জ ণ র্জ ঋ ত রি

২৫ মে সংখ্যার উত্তর

(১) অবনমন (২) অনাথবন্ধু

২৫ মে সংখ্যার উত্তর

(১) আচরণবিধি (২) আঘাতজনিত

(১) কৃত্তিকা মণ্ডল, মকদুমপুর, মালদা। (২) কুহেলী বিশ্বাস, কালিবাড়ী, বাঁশদ্রোণী, কল-৭০। (৩) শিবম রায়, ডায়মন্ডহারবার, দঃ ২৪ পরগনা। (৪) অশোক রায়, গাজোল, মালদা

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ

স্বস্তিকা

২৭/১বি, বিধান সরণি

কলকাতা - ৭০০ ০০৬

হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/ সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯

ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪ ৯০৫১৭২১৪২০

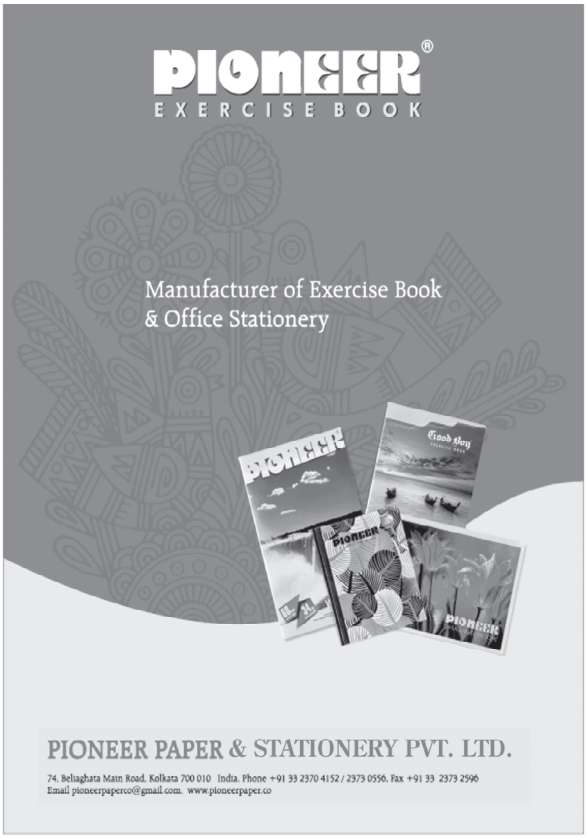

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন

মিউচুয়াল ফান্ডে SIP করুন

(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)

কি জন্য করবেন?

- ★ RETIREMENT PLANNING.
- ★ CHILDREN EDUCATION FUND.
- ★ DAUGHTER MARRIAGE FUND.
- ★ WEALTH CREATION.
- ★ ANY OTHER SHORT & LONG TERM PLAN

DRS INVESTMENT ✆ 8240685206 9748978406

Email: drsinvestment@gmail.com || Website: www.drsinvestment.com

NPS | Mutural Fund | Insurance | Mediclaim | Fixed Deposit | Bond

পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পুনর্জাগরণ

হিন্দুত্ব, জাতীয়তাবোধ ও ২০২৬-এর নতুন দিগন্ত

পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে গত কয়েক বছরে যে পরিবর্তন দেখা গেছে, তা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। আগে যেখানে বিজেপিকে বহিরাগত অবাঙ্গালি শক্তি হিসেবে সেকুলার দলগুলি দাগিয়ে দিত, সেখানে আজ বহু সাধারণ মানুষ মনে করছেন যে, জাতীয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত না থাকলে পশ্চিমবঙ্গের বাস্তব উন্নয়ন সম্ভব নয়।

ড. প্রসেনজিৎ মুখোপাধ্যায়

২০২৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন শুধু একটি রাজনৈতিক পালাবদল নয়— এটি পশ্চিমবঙ্গের দীর্ঘ সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মানসিক পরিবর্তনের বহিঃপ্রকাশ। দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে বামপন্থা, আঞ্চলিকতা এবং তোষণ-রাজনীতির মধ্যে আবদ্ধ পশ্চিমবঙ্গের জনমানস বর্তমানে এক নতুন রাজনৈতিক অভিমুখের দিকে অগ্রসর হয়েছে। ভারতীয় জনতা পার্টির বিপুল জয় সেই পরিবর্তনেরই প্রতীক। এই বিজয়ের মধ্যে রয়েছে ক্ষোভ, প্রত্যাশা, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয়ের সন্ধান এবং জাতীয় মূলধারার সঙ্গে বাঙ্গালির পুনঃসংযোগের আকাঙ্ক্ষা। এই নির্বাচনে একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়— হিন্দু ভোটের অভূতপূর্ব সংহতি সাধন।

বঙ্গভূমি একদিন ভারতের নবজাগরণের কেন্দ্র ছিল। স্বামী বিবেকানন্দ, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীঅরবিন্দ, ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, নেতাজী সুভাষচন্দ্র প্রমুখ মহাপুরুষের চিন্তায় জাতীয়তাবোধ ও সাংস্কৃতিক চেতনা এক গভীর ভিত্তি লাভ করেছিল। কিন্তু স্বাধীনতার পর ধীরে ধীরে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিসরে এমন এক বিভ্রান্তিকর বুদ্ধিবৃত্তিক ধারা তৈরি হয়, যেখানে 'হিন্দু' পরিচয়কে গৌণ করে 'শ্রেণী সংগ্রাম' বা 'ধর্মনিরপেক্ষতা'-র সংকীর্ণ ব্যাখ্যাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। এর ফলে পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুসমাজের মধ্যে এক ধরনের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অনিশ্চয়তা জন্ম নেয়।

বিগত কয়েক দশকে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ প্রত্যক্ষ করেছে রাজনৈতিক হিংসা, ব্যাপক দুর্নীতি, শিক্ষক নিয়োগ কেলেঙ্কারি, কাটমানি আদায়, সীমান্তবর্তী অঞ্চলে অনুপ্রবেশ এবং প্রশাসনিক পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ। সাধারণ মানুষ উপলব্ধি করতে শুরু করে যে, শুধুমাত্র 'জয় বাংলা' স্লোগান দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন সম্ভব নয়। উন্নয়নের সঙ্গে চাই সুশাসন, নিরাপত্তা, আত্মমর্যাদা এবং সাংস্কৃতিক গরিমা। ভারতীয় জনতা পার্টির উত্থান এই মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তনের ফল।

তথাকথিত 'ধর্মনিরপেক্ষ' দলগুলি যে মুসলমান ভোটব্যাংককে প্রায় অবিচল ও ঐক্যবদ্ধ বলে ধরে নিয়েছিল, সেখানে একটি প্রচলিত সত্য বহুবার সামনে এসেছে— হিন্দু ভোট জাতপাতের ভিত্তিতে বিভক্ত, কিন্তু মুসলমান ভোট হলো সুসংহত ও দৃঢ়। কিন্তু সদ্য সমাপ্ত পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল সেই ধারণাকে এক বড় চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড় করিয়েছে। প্রশ্ন উঠছে— কেন পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু ভোট এত ব্যাপকভাবে বিজেপির পক্ষে ঐক্যবদ্ধ হলো? কেন মুসলমান ভোটের একটি বড়ো অংশ তৃণমূল কংগ্রেসের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণে থাকল না? এই প্রশ্নগুলির উত্তর খুঁজতে গেলে সমাজ, ইতিহাস, রাজনীতি, সংস্কৃতি ও মনস্তত্ত্ব— সবকিছুর দিকেই তাকাতে হবে।

এই নির্বাচনে 'হিন্দুত্ব' একটি গুরুত্বপূর্ণ আদর্শগত শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, ২০২৬ সালের নির্বাচনে বহু এলাকায় উপাসনা পদ্ধতিগত মেরুকরণ এবং হিন্দু ভোটের একত্রীকরণ ভারতীয় জনতা পার্টির সাফল্যের অন্যতম প্রধান কারণ। পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু সমাজ ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিকভাবে শক্তিশালী হলেও রাজনৈতিকভাবে দীর্ঘদিন বিভক্ত ছিল। বামপন্থা, তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতা, আঞ্চলিকতা ও জাতপাতের বিভিন্ন ধারায় হিন্দু ভোট বিচ্ছিন্ন ছিল। গত কয়েক বছরে পশ্চিমবঙ্গের বহু হিন্দু ভোটারের মধ্যে একটি অনুভূতি ক্রমশ প্রবল হয়েছে যে, তারা রাজনৈতিকভাবে উপেক্ষিত। বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার পরিস্থিতি, সীমান্তবর্তী অঞ্চলে জনসংখ্যাগত পরিবর্তন, বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতনের খবর এবং স্থানীয় স্তরে মুসলমানদের প্রতি প্রশাসনিক পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ হিন্দুদের মনে এক ধরনের নিরাপত্তাহীনতার জন্ম দিয়েছে। নির্বাচনী প্রচারে হিন্দুদের উদ্দেশ্যে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীর হুমকি, 'আমরা চলে গেলে একটি সম্প্রদায়ের এক মিনিটও লাগবে না আপনাদের শেষ করতে, অতএব সাবধান!'— এরাজ্যের হিন্দুদের মনে পুঞ্জীভূত ক্ষোভের আগুনে ঘি ঢেলেছে। যখন পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু ভোটারদের একটি বড়ো

ফঃ ৬

অংশ মনে করতে শুরু করল যে তাঁদের ধর্মীয় পরিচয় ও নিরাপত্তা প্রশ্নের মুখে, তখন তাঁরা রাজনৈতিকভাবে ঐক্যবদ্ধ হতে শুরু করে।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ এবং অন্যান্য রাষ্ট্রভক্ত সংগঠনগুলি দীর্ঘদিন ধরে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চল, সীমান্তবর্তী অঞ্চল এবং শহরতলিতে সাংগঠনিক কাজ করছে। শিক্ষা, সেবা, স্বাবলম্বন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং সমাজসংযোগের মাধ্যমে তারা এক নীরব সামাজিক সংহতি গড়ে তুলেছে। তারা হিন্দু পরিচয়কে শুধুমাত্র জাতিগত নয়, সাংস্কৃতিক ও সভ্যতাগত পরিচয় হিসেবে তুলে ধরেছে। বহু মানুষ মনে করতে শুরু করেছে যে নিজের সভ্যতাগত পরিচয় নিয়ে গর্ব করা 'সাম্প্রদায়িকতা' নয়। আজকের রাজনৈতিক পরিবর্তনের পিছনে সঙ্ঘের সেই দীর্ঘ সাংগঠনিক পরিশ্রমের ভূমিকাও অনস্বীকার্য।

দীর্ঘদিন ধরে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে 'সংখ্যালঘু তোষণ'-এর অভিযোগ একটি বড়ো ইস্যু ছিল। ইমাম ভাতা, মোয়াজ্জেম ভাতা, বহু ক্ষেত্রে মুসলমানদের দ্বারা সংঘটিত অপরাধ ইত্যাদি ব্যাপারে প্রশাসনিক নমনীয়তা, তাদের মজহবি অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে আলাদা সরকারি নীতি— এই সব বিষয় নিয়ে বহু হিন্দু ভোটারের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছিল। তৃণমূল কংগ্রেসের বিরোধীরা দীর্ঘদিন ধরে অভিযোগ করেছে যে সরকার 'মুসলমান ভোটব্যাংক'-এর জন্য একপাক্ষিক রাজনীতি করছে। 'তথাকথিত সংখ্যালঘু' তোষণের পরিণামে রাজ্যে মাদ্রাসা ও জেহাদি সন্ত্রাসের বাড়বাড়ন্ত হয়, যা রাজ্যের সংখ্যাগুরু হিন্দুদের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভের সঞ্চার করে। ভারতীয় জনতা পার্টি এই আবেগকে 'হিন্দু সংহতি'র রাজনৈতিক রূপ দিতে সক্ষম হয়েছে।

বাংলাদেশে গত এক বছরে হিন্দুদের উপর ধারাবাহিক আক্রমণের খবর পশ্চিমবঙ্গের জনমনে গভীর প্রভাব ফেলেছে। মন্দির ভাঙচুর, হিন্দু পরিবার আক্রান্ত হওয়া, হিন্দু নারীদের উপর অত্যাচারের অভিযোগ— এই ঘটনাগুলি পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের আবেগকে নাড়া দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের বহু পরিবারের শিকড় পূর্ববঙ্গে। ফলে বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতনের খবরকে তারা 'বিদেশের ঘটনা' হিসেবে নয়, আত্মীয়-স্বজনের ওপর আক্রমণ হিসেবেই দেখেছে। বিগত এক বছরে বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর একাধিক আক্রমণের খবর আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম এবং মানবাধিকার সংগঠনগুলির রিপোর্টে উঠে এসেছে। কিছু রিপোর্টে বলা হয়েছে যে সংখ্যালঘু হিন্দুরা প্রকাশ্যে ধর্মীয় পরিচয় বহন করতেও ভয় পাচ্ছেন। এক্ষেত্রে সামাজিক মাধ্যমের ভূমিকাও বিশাল। ফেসবুক, ইউটিউব, হোয়াটসঅ্যাপ--- এই সমস্ত প্ল্যাটফর্মে বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতনের ভিডিয়ো, সংবাদ এবং বিশ্লেষণ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।

২০২৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ভারতের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ মোড় হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এই নির্বাচন তাই শুধুমাত্র ক্ষমতার পরিবর্তন নয়— এটি এক মানসিক পরিবর্তনের প্রতীক।

এই আবেগগত প্রভাবের সঙ্গে যুক্ত হয় মুর্শিদাবাদ-সহ কয়েকটি অঞ্চলে রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা। যখন বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতনের খবরের সঙ্গে স্থানীয় উত্তেজনার পরিবেশ যুক্ত হলো, তখন এক ধরনের 'অস্তিত্বগত উদ্বেগ' তৈরি হয়। 'অস্তিত্ব সংকট'-এর সম্মুখীন হয়ে হিন্দুসমাজের মধ্যে তৈরি হওয়া এই উদ্বেগই ধীরে ধীরে ভোটারদের আচরণে প্রতিফলিত হতে শুরু করে। সীমান্তের ওপারের ঘটনা আর কেবল 'বিদেশনীতি'র বিষয় নয়; তা এখন পশ্চিমবঙ্গের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক আলোচনার অংশ হয়ে উঠেছে। ফলত, বহু ভোটার মনে করেছেন যে এমন একটি রাজনৈতিক শক্তির প্রয়োজন, যারা প্রকাশ্যে হিন্দু স্বার্থ ও নিরাপত্তার বিষয়টি ভাবতে পারে। বিজেপি সেই আস্থা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। বিশেষত তৎকালীন বিরোধী দলনেতা বর্তমানে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর বাংলাদেশের হিন্দুদের অধিকার রক্ষায় আক্রমণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গী পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু জনগণের ভরসা অর্জনে সমর্থ হয়েছে।

এই নির্বাচনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো অনেকগুলি বিধানসভা কেন্দ্রে মুসলমান ভোটের বিভাজন। দীর্ঘদিন ধরে পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান ভোট মূলত তৃণমূল কংগ্রেসের দিকে একতরফাভাবে ছিল। কিন্তু ২০২৬-এ সেই সমীকরণে ফাটল দেখা যায়। এর পিছনে কয়েকটি কারণ গুরুত্বপূর্ণ। মুসলমান সম্প্রদায়ের একাংশ মনে করছিল যে তাদের 'নিশ্চিত ভোটব্যাংক' ধরে নিয়ে সেকুলার দলগুলির পক্ষ থেকে তাদের রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করা হলেও বাস্তবে তাদের শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে কোনো পরিবর্তন আসেনি। ফলে নতুন প্রজন্মের তরুণ মুসলমান ভোটারদের মধ্যে অসন্তোষ বাড়তে থাকে, তারা শুধুমাত্র মজহবি পরিচয়ের ভিত্তিতে ভোট দিতে আগ্রহী ছিল না। বিভিন্ন জেলায় তৃণমূলের স্থানীয় নেতাদের মধ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বও মুসলমান ভোটকে বিভক্ত করেছে। কিছু এলাকায় নির্দল, আইএসএফ বা ছোটো আঞ্চলিক শক্তির দিকে মুসলমান ভোট সরে যায়। যেসব দল রাজ্যস্তরে বিজেপিকে আটকানোর বাস্তব সম্ভাবনাই রাখত না, যেমন INC, AJUP, CPM, AIMIM প্রভৃতি— তারা উল্লেখযোগ্যভাবে বিভিন্ন বিধানসভা আসনে সেই মুসলমান ভোট কেটে নিতে সক্ষম হয়েছে, যে ভোট প্রাপ্তিকে তৃণমূলনেত্রী হয়তো নিজের রাজনৈতিক অধিকার বলেই ধরে নিয়েছিলেন।

কয়েকটি মুসলমান-প্রধান আসনের উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যাক। মুর্শিদাবাদ জেলায় পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে সর্বাধিক মুসলমান জনসংখ্যা রয়েছে। মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত বেলডাঙ্গা বিধানসভা কেন্দ্রেও মুসলমান ভোটার সংখ্যা অত্যন্ত বেশি। অথচ এখানে বিজেপির টিকিটে ভরত কুমার ঝাওয়ার জয়ী হয়েছেন। ২০২১ সালে

বিজেপি এখানে ২৮.৯ শতাংশ ভোট পেয়েছিল। তৃণমূল কংগ্রেস ৫৫ শতাংশেরও বেশি ভোট পেয়ে আসনটি জিতেছিল। কংগ্রেস, যা তখন বাম-আইএসএফ জোটের অংশ ছিল, পেয়েছিল ১৩ শতাংশ ভোটের সামান্য বেশি। কিন্তু এবারে ২০২৬ সালে বিজেপি তাদের ভোট শতাংশ মাত্র তিন পয়েন্ট বাড়িয়ে ৩১.৮৮ শতাংশে নিয়ে যায়। বেলডাঙ্গার মোট জনসংখ্যার প্রায় ৬৩ শতাংশ মুসলমান বলে ধরা হয়; ফলে বিজেপির এই ভোট কার্যত প্রায় সম্পূর্ণ হিন্দু ভোটের সংহতিকেই নির্দেশ করে। অন্যদিকে তৃণমূলের ভোট শতাংশ ৫৫ থেকে নেমে ২৬ শতাংশে এসে দাঁড়ায়। এর মধ্যে ২০.৪ শতাংশ ভোট চলে যায় হুমায়ুন কবিরের AJUP-র দিকে এবং আরও ৪.৫ শতাংশ ভোট কংগ্রেসের দিকে সরে যায় (ফলে এবার কংগ্রেসের ভোট ১৩ শতাংশ থেকে বেড়ে ১৭.৫ শতাংশ হয়)। অর্থাৎ, এই বিধানসভা কেন্দ্রে হিন্দু ভোট আরও দৃঢ়ভাবে একজোট হয়েছে এবং মুসলমান ভোট বিভক্ত হয়েছে।

জঙ্গিপুর আরেকটি মুসলমান-প্রধান আসন (যেখানে প্রায় ৪৯ শতাংশ মুসলমান ভোটার), যেটি বিজেপি তৃণমূলের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে। এখানে বিজেপির ভোট শতাংশ ২০২১ সালের ২২ শতাংশ থেকে বেড়ে ৪২ শতাংশে পৌঁছায়। কংগ্রেসও তাদের ভোট বাড়িয়ে ১৫ শতাংশে নিয়ে যায় (প্রায় ৩১ হাজার ভোট)। ফলাফল— তৃণমূল ১০,৫৪২ ভোটে পরাজিত হয়।

বিশেষজ্ঞদের মতে, ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচন স্পেশাল ইন্টেন্সিভ রিভিশন বা এসআইআর-এর আবহে ভোট অনুষ্ঠিত হওয়ায় ধারণা করা হয়েছিল যে, পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান ভোটাররা জোটবদ্ধভাবে তৃণমূল কংগ্রেসকে সমর্থন করবে। কিন্তু বাস্তবে সেই ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। এসআইআর প্রক্রিয়ায় ব্যাপক নাম বাদ পড়ার প্রভাবও তৃণমূলকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।

সিএএ বা নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন এই নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। মতুয়া সমাজ, নমঃশূদ্র সম্প্রদায় এবং পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তু পরিবারগুলির মধ্যে ভারতীয় নাগরিকত্বের প্রশ্ন দীর্ঘদিনের আবেগের বিষয় ছিল। বহু উদ্বাস্তু পরিবার মনে করেছে যে বিজেপি তাদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি ও নিরাপত্তা দিতে আগ্রহী।

রাজ্যের সরকারি বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি, চাকরিহারা শিক্ষকদের শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভে পুলিশের লাঠিচার্জ ও পদাঘাত, স্থানীয় স্তরে দলীয় দখলদারি, কাটমানি, কয়লা চুরি, গোরু চুরি, ডি.এ. আন্দোলনরত সরকারি কর্মচারীদের 'ঘেউ ঘেউ' করতে বারণ করা, কামদুনি-পার্ক স্ট্রিট-হাঁসখালি-আরজি করের নারী-নির্যাতনের ঘটনায় প্রশাসনিক তৎপরতায় দোষীদের আড়াল করা, ইডি তল্লাশির সময়ে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীর আইপ্যাকের দপ্তর থেকে ফাইল চুরি— এই সমস্ত বিষয় সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি করেছিল। হিন্দু ভোটের সংহতির পিছনে শুধু জাতিগত আবেগ নয়, প্রশাসনিক অসন্তোষও বড় কারণ। মানুষ মনে করতে শুরু করে যে, দীর্ঘদিন একই রাজনৈতিক শক্তি ক্ষমতায় থাকলে এক ধরনের 'অহংকার' ও 'দুর্নীতি'র সিন্ডিকেট তৈরি হয়। বিজেপি এই ক্ষোভকে 'পরিবর্তন' ও 'সুশাসন'-এর দাবির সঙ্গে যুক্ত করেছে।

পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে গত কয়েক বছরে যে পরিবর্তন দেখা গেছে, তা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। আগে যেখানে বিজেপিকে বহিরাগত অবাঙ্গালি শক্তি হিসেবে সেকুলার দলগুলি দাগিয়ে দিত, সেখানে আজ বহু সাধারণ মানুষ মনে করছেন যে, জাতীয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত না থাকলে পশ্চিমবঙ্গের বাস্তব উন্নয়ন সম্ভব নয়। কেন্দ্র-রাজ্য সমন্বয়ের ক্ষেত্রে ডবল ইঞ্জিন সরকারের তত্ত্বটি এবারের ভোটে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। পরিকাঠামো, শিল্প, রাস্তা, রেল, ডিজিটাল পরিষেবা— এই সব ক্ষেত্রেই মানুষ বাস্তব পরিবর্তন প্রত্যাশা করেছে। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো যুবসমাজের মানসিকতা। দীর্ঘ বেকারত্ব, সর্বস্তরের তৃণমূল নেতাদের লাগামছাড়া দুর্নীতি, সরকারি চাকরি বিক্রি এবং কর্মসংস্থানের সুযোগের অভাবে ঘুগনি ও চপ শিল্পের পরামর্শে বহু তরুণ-তরুণী ক্ষুব্ধ ছিল। তারা এমন এক রাজনৈতিক শক্তিকে সমর্থন করতে চেয়েছে, যারা শুধুমাত্র 'পরিবর্তন' নয়, 'পুনর্গঠন'-এর কথা বলে।

২০২৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ভারতের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ মোড় হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এই নির্বাচন তাই শুধুমাত্র ক্ষমতার পরিবর্তন নয়— এটি এক মানসিক পরিবর্তনের প্রতীক। বহু বছর পরে পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষ আবার নিজেদের ঐতিহ্য, আত্মপরিচয় ও জাতীয় গৌরব নিয়ে নতুনভাবে ভাবতে শুরু করেছে। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয়ের পাশাপাশি শিল্প, শিক্ষা, চাকরি ও নিরাপত্তাও চায়। যদি উন্নয়ন ও সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয়ের সমন্বয় ঘটানো যায়, তবে পশ্চিমবঙ্গ আবার ভারতের অন্যতম অগ্রগণ্য রাজ্যে পরিণত হতে পারে। শিল্প, শিক্ষা, সাহিত্য, প্রযুক্তি ও আধ্যাত্মিকতার সমন্বয়ে পশ্চিমবঙ্গ নতুন পথ দেখাতে পারে সমগ্র দেশকে। এই পরিবর্তন কতটা স্থায়ী হবে, তা নির্ভর করবে নতুন সরকারের কর্মদক্ষতা, সাংগঠনিক শক্তি এবং মানুষের প্রত্যাশা পূরণের উপর। কিন্তু একটি বিষয় স্পষ্ট— পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে, যেখানে হিন্দুত্ব, জাতীয়তাবোধ ও উন্নয়নের প্রশ্ন আগামীদিনের রাজনৈতিক আলোচনার কেন্দ্রে থাকবে।

[*লেখক বঙ্গবাসী কলেজ (রাত্রিকালীন বিভাগ)-এর উপাধ্যক্ষ*]

স্বস্তিকার বিজ্ঞাপনের দরপত্র (এক সপ্তাহের জন্য)

Back Cover	(Multi Colour)	Rs. 32,000.00
Front Inside	(Multi Colour)	Rs. 25,000.00
Back Inside	(Multi Colour)	Rs. 25,000.00
Full Page	(Multi Colour)	Rs. 20,000.00
Full Page	(Black & White)	Rs. 15,000.00
Half Page	(Black & White)	Rs. 8,000.00
Qtr. Page	(Black & White)	Rs. 4,000.00

** *বিজ্ঞাপনের টাকা জমা পড়লে বিজ্ঞাপন ছাপানো হবে।*

যোগাযোগ — মো : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

‘বন্দে মাতরম্’ : শ্রীঅরবিন্দের জাতীয়তাবাদী নির্দেশ

সৈকত নিয়োগী

বিপ্লবের রঙ্গমঞ্চে বিদ্রোহের সংলাপ। মহাযোগীর কলম নিঃসৃত বিপ্লবমন্ত্র বিস্ফোরকের মতো ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। পাশ্চাত্যের দর্শন, জৌলুসপূর্ণ জীবনযাপন উপেক্ষা করে ফিরে আসেন দেশমাতৃকার টানে। ধর্মই যখন অস্ত্র, মসিতেই অনুরণিত হয় অসির ঝংকার।

শ্রীঅরবিন্দের অনুপ্রেরণায় একের পর এক জাতীয়তাবাদী পত্রিকা তখন ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করছে। বিংশ শতকের সূচনালগ্ন এক অঘোষিত সংগ্রামকাল। ফিরিঙ্গিদের সংহার করতে মেঠো ভাষায় সংযমের মাত্রা অতিক্রম করতেও কুণ্ঠিত হয়নি ‘সন্ধ্যা’ পত্রিকা। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের হাত ধরে বঙ্গভূমিতে বিদেশি শাসক ব্রিটিশদের চিহ্নিত করতে ‘ফিরিঙ্গি’ শব্দের প্রচলন হয়। ষোড়শ শতাব্দীতে পর্তুগিজদের হাত ধরে ভারতে সিফিলিস রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটলে রোগীদের চিহ্নিতকরণে সংস্কৃতে চিকিৎসা শাস্ত্রে ‘ফিরাঙ্গামায়া’ শব্দের উদ্ভব লক্ষণীয়। চণ্ডীমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল কাব্যে এই শব্দের ব্যবহার ছিল। সন্ধ্যা পত্রিকায় ব্রহ্মবান্ধব লিখলেন— ‘আমরা ফিরিঙ্গিদের ঘৃণা করি না, ফিরিঙ্গিয়ানাকে ঘৃণা করি।’ (সন্ধ্যা পত্রিকা ৩১ অক্টোবর, ১৯০৭)

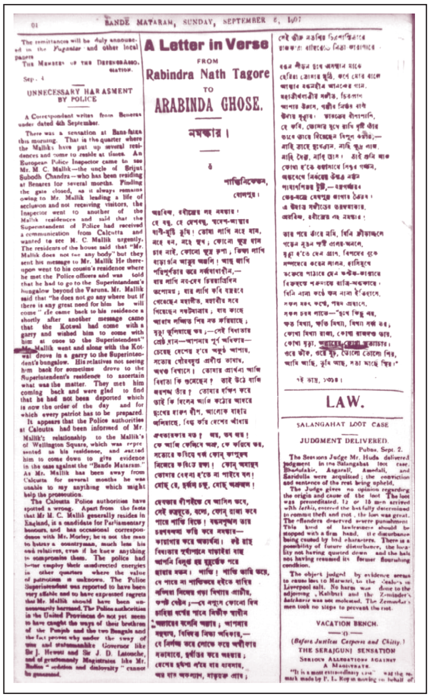

BANDE MATARAM, SUNDAY, SEPTEMBER 8, 1907

A Letter in Verse FROM Rabindra Nath Tagore TO ARABINDA GHOSE.

নমস্কার।

UNNECESSARY HARASSMENT BY POLICE

LAW.

SALANGAHAT LOOT CASE

JUDGMENT DELIVERED.

VACATION BENCH.

THE SERAJGUNJ SENSATION

ব্রহ্মবান্ধবের বেদান্ত দর্শনের সঙ্গে তৎকালীন সামাজিক ব্যাধি এবং রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটকে মিলিয়ে দেওয়ার এমন অপূর্ব রচনাশৈলী ব্রিটিশ শাসকের তাঁবেদার পুলিশ প্রশাসন উপলব্ধি করতে পারেনি। তবে ফিরিঙ্গি শব্দ এবং তার বিদ্রূপাত্মক প্রয়োগ বিলক্ষণ বুঝেছিল। ফলে সন্ধ্যা পত্রিকার বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের মামলার দায়ের হয়। মামলা চলাকালীন ব্রহ্মবান্ধব সিদ্ধান্ত নেন— সন্ন্যাসীর পবিত্র গেরুয়া পোশাক পরে ম্লেচ্ছ ব্রিটিশদের বিচারালয়ে উপস্থিত হবেন না। তাই তিনি ধর্মের পবিত্রতা রক্ষার্থে সন্ন্যাস ত্যাগ করলেন এবং নিপাট বাঙ্গালিবাবুর বেশে বিচারালয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। অন্তিমকাল যখন ঘনিয়ে আসে, ঈশ্বরের কাছে তিনি ধন্যবাদ জানালেন ব্রিটিশ কারাগারে নিক্ষেপ না করে পরমব্রহ্মে তাকে বিলীন করে নেওয়ার জন্য।

ব্রহ্মবান্ধবের মৃত্যুর পরে সন্ধ্যা মামলার আর প্রাসঙ্গিকতা থাকলো না। সকল অভিযুক্ত মুক্ত হলেন।

কিন্তু ততদিনে ব্রিটিশ শাসক সচেতন হয়ে গিয়েছে; জাতীয়তাবাদী পত্রপত্রিকার প্রভাবে জনমানসে আগুন ঝরছে। ১৯০৭ সালের মার্চ মাস, যুগান্তর পত্রিকার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হলো। আগস্ট মাসে সরকারের দৃষ্টি পড়ল শ্রীঅরবিন্দের ‘বন্দে মাতরম্’ পত্রিকার উপর। আনা হলো রাজদ্রোহের মামলা। করা হলো ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ। বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনে তখন জেরবার বঙ্গ, দিশেহারা প্রশাসন। পুলিশ নিষ্ঠুরভাবে দমনপীড়নের নীতি কার্যকর করে। বিনা বিচারে নির্বাসিত হলেন লালা লাজপত রায়, বিপ্লবী ভগৎ সিংহের কাকা সর্দার অজিত সিংহ। পঞ্জাবের জাতীয়তাবাদীদের উদ্দেশ্যে শ্রীঅরবিন্দের বার্তা— ‘অস্ত্র ধরো, অস্ত্র ধরো! সময় এসেছে সরকারের অবিচার অত্যাচার নতশিরে মেনে না নিয়ে প্রতিবাদে মুখর হওয়ার। ওরা একজন লালা লাজপত রায়কে বন্দি করলে ঘরে ঘরে লাজপত রায় জন্ম নেবে। পঞ্জাবের ঘরে ঘরে রয়েছে সিংহ!’

‘Lala Lajpat Rai Departed’ শিরোনামে কলম ধরলেন ‘বন্দে মাতরম্’ পত্রিকায়—

“The systematic administration of Mr. Morley has for the present attained its records—but for the present only. Lala Lajpat Rai has been departed out of British India. The fact is its own comment. The Telegram goes on to say that indignation meetings have been forbidden for four days. Indignation meetings? The hour of speeches and fine writings are past. The bureaucracy has thrown down the gauntlet. We take it up. Men of the Punjabæ Race of the lionæ Show these men who would stamp you into the dust that for one Lajpat they have taken away– a hundred Lajpats will arise in his place. Let them hear a hundred times louder your warcry— Jai Hindusthan!”

বঙ্গে ব্রিটিশ শাসক এক অভিনব নীতি গ্রহণ করে। তাদের লক্ষ্য বঙ্গভঙ্গকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে হবে মানুষের মনে। তাই নাগরিক জীবনে প্রয়োজন জাতিবিদ্বেষ-জনিত বিষের অন্তর্নিহিত দাপট। হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে জাতিবিদ্বেষ বলবৎ করতে জাতীয়তাবোধে বিশ্বাসী হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বিভেদের প্রাচীর নির্মাণ। ব্রিটিশ শাসকের প্রত্যক্ষ প্রেরণায় মুসলিম লিগ প্রতিষ্ঠা করা হয়। ঢাকার নবাব সলিমুল্লাকে অকল্পনীয় পরিমাণ নজরানা দিয়েছিল ব্রিটিশ শাসক। ঢাকাতেই মুসলমানদের উত্তপ্ত করে তুলতে লাগল মুসলিম লিগ। পূর্ববঙ্গ ও অসমে এই দলের দাপটের কথা লিখলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক নেভিনসন।

লিখলেন 'দ্য নিউ স্পিরিট ইন ইন্ডিয়া'। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ন্যক্কারজনক রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ উপেক্ষা করে শ্রীঅরবিন্দের সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়ে এলেন ব্রিটিশ শ্রমিক নেতা কেয়ার হার্ডি। ততদিনে জামালপুর, কুমিল্লা প্রভৃতি স্থানে জেহাদি সন্ত্রাস ভয়াবহ আকার নিয়েছে। মুসলিম লিগের প্রত্যক্ষ ইন্ধনে হিন্দুদের বাড়িতে লুণ্ঠন, হত্যা, ধর্ষণ, বিধবাদের অপহরণের ঘটনা ঘটে। বাসন্তীপূজা চলাকালীন বিগ্রহ ধ্বংস করা হয়। শ্রীঅরবিন্দ এই বিপর্যয়ের উৎস সন্ধানে কংগ্রেসের ব্যর্থতার কথা স্বীকার করে বলেন, কংগ্রেসের আন্দোলন সমাজের সর্বস্তরে বিস্তৃত নয়। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, মসজিদের ইমাম, ধর্মীয় সংগঠন প্রভৃতির মধ্যে জাতীয় চেতনার বিকাশ ঘটেনি। যখনই ব্রিটিশের প্রশাসনিক নীতির বিরুদ্ধে বঙ্গবাসী গর্জে ওঠে, বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতার অজুহাতে ব্রিটিশদের প্রকৃত চরিত্রের অবগুণ্ঠন খসে পড়ে।

"An Englishman assaulting an Indian may be innocent or guilty– but– as he can not be punished it does not matter an atom whether he is innocent or guilty. The fight has to be fought out to the end and the resort to law is no more than a persistent superstition."

তিলকের 'কেশরী' পত্রিকাতেও এর তীব্র নিন্দা এবং ব্রিটিশ প্রশাসনকে ধিক্কার জানিয়ে ক্রমশই খবর প্রকাশ করা হয়। যুগান্তর পত্রিকায় ব্রিটিশ শাসনকে 'দানবীয়' বলে চিহ্নিত করে দু'টি প্রবন্ধ লেখার জন্য স্বামী বিবেকানন্দের ভাই ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত গ্রেপ্তার হন। ১৯০৭ সালের ২৪ জুলাই তাঁর এক বছরের কারাদণ্ড হয়।

বন্দে মাতরম্ পত্রিকার প্রারম্ভিক কালে কলকাতার হরিদাস হালদার প্রকাশনার দায়িত্ব ভার নিয়েছিলেন। ১৯৩ নম্বর কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের ঠিকানায় সারস্বত প্রেসে মুদ্রণ স্থান। প্রকাশক ছিলেন এ পি মুখার্জি। ম্যানেজার এন এল দত্ত। রেজিস্ট্রেশন হয় 'বন্দে মাতরম্ প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স লিমিটেড' নামে। পরে কার্যালয় স্থানান্তরিত হয় ২/১ নম্বর ক্রিক রোডে স্বর্গীয় রাজা সুবোধ মল্লিকের বাড়িতে। ডিরেক্টর বোর্ড গঠিত হলে সেখানে রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক, শরৎচন্দ্র সেন, সুরেন্দ্রমোহন দাস, সুরেন্দ্রনাথ হালদার, হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ, বিপিনচন্দ্র পাল, রজনীনাথ রায়, বিজয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, চিত্তরঞ্জন দাশের সঙ্গে ছিলেন শ্রীঅরবিন্দ। সকলেই কোম্পানির শেয়ার হোল্ডার।

সম্পাদকমণ্ডলীতে ছিলেন শ্রীঅরবিন্দ, হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, বিপিনচন্দ্র পাল। বিদেশি শাসকের ভারত লুণ্ঠন প্রসঙ্গ তুলে একরকম কার্লাইলদের অর্থ আদায়ে বল প্রয়োগের মতো করে স্বরাজ ছিনিয়ে নিয়ে যুগান্তর পত্রিকায় লেখা হয় ' কাবলি দাওয়াই'। লেখাটির অনুবাদ ইংরেজিতে প্রকাশিত হয়েছিল 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকায়। সেই প্রবন্ধ প্রকাশের কারণে রাজদ্রোহের অভিযোগে গ্রেপ্তার হলেন শ্রীঅরবিন্দ ও মুদ্রাকর অপূর্বকৃষ্ণ বসু। তখন ব্রিটিশ শাসক মরিয়া শ্রীঅরবিন্দকে 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকার সম্পাদক প্রমাণ করতে। অপর দিকে বিপিনচন্দ্র পালকে নানাভাবে পুলিশ অপদস্থ করে। সব সহ্য করেও তিনি নীরব। কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে হলফনামা গ্রহণে অস্বীকার করে আদালত অবমাননার দায়ে দণ্ড পেলেন। তবে মুক্তি পেলেন বন্ধু নায়ক শ্রীঅরবিন্দ। 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে তাঁকে প্রমাণ করতে পারল না পুলিশ। মানবদরদি, বিপ্লবসঙ্গী কবি রবীন্দ্রনাথ কাব্যিক 'দেশনায়ক' নামে তাঁকে হৃদয়াসনে স্বীকৃতি দিলেন। 'দেশনায়ক' হলো একটি উপাধি যা কবিগুরু দিতে চেয়েছিলেন ভারতবর্ষের অবিসংবাদী নেতাকে বা ভারতবর্ষের মুক্তিদাতাকে। প্রথমে বাল গঙ্গাধর তিলককে এই সম্মানে ভূষিত করার বিষয়ে তিনি মনস্থ করেন। কিন্তু তিলকের আন্দোলন মহারাষ্ট্রের মধ্যেই নানাভাবে সীমাবদ্ধ থেকে জাতীয় চরিত্র পরিগ্রহ করতে না পারার কারণে শ্রীঅরবিন্দকে 'দেশনায়ক'-এর স্বীকৃতি দানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন বিশ্বকবি। বিপ্লবী আন্দোলন ও প্রত্যক্ষ রাজনীতি পরিত্যাগ করে শ্রীঅরবিন্দ সন্ন্যাস গ্রহণ করার পর সুভাষচন্দ্র বসুকে 'দেশনায়ক'-এর পদে বরণ করেন গুরুদেব।

ব্রিটিশ সরকারের একপ্রকার মুখপত্র স্টেটসম্যান পত্রিকা লিখেছিল—

"They are too diabolically clever– crammed full of sedition between the lines– but legally unattackable because of the skill of language."

বিরূপ প্রতিক্রিয়ায় শ্রীঅরবিন্দ স্মৃতিবাক্যপূর্ণ সংবাদ প্রকাশ করে জাতীয়তাবাদী পত্রপত্রিকা। 'দ্য হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকা লিখেছিল—

"He is one of those men to be in whose company is a joy– and behind whose exterior is a steadily growing fire of intense devotion to a cause."

জ্ঞানগম্ভীর উদাসীন শ্রীঅরবিন্দের বিষয়ে সাহিত্যিক উপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য তাঁর 'ভারতবর্ষে শ্রীঅরবিন্দ প্রসঙ্গে' লিখেছেন—

" 'বন্দে মাতরম্' শ্রীঅরবিন্দের মানস সন্তান। তাই হৃদয়ের রক্ত চালাইয়া তিনি ইহাকে নবীন দলের শক্তিশালী ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী মুখপত্রে পরিণত করিয়াছিলেন। ভারতে জাতীয় ভাবধারা প্রচারের গৌরব সেদিন 'বন্দে মাতরম্' যেভাবে লাভ করিয়াছিল এবং সেই দুষ্প্রাপ্য গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য ইহার যে একনিষ্ঠ ও নির্ভীক প্রয়াস, তাহা ভারতের সংবাদপত্রের ইতিহাসে চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে...

'বন্দে মাতরম্' দেশের লোকের চিন্তায় বিপ্লব আনিয়া দিল, দলের শক্তি বৃদ্ধি করিল, ইতিহাসের মোড় ফিরাইয়া দিল, নবীন ও প্রবীণের সংঘর্ষ আসন্ন ও অনিবার্য করিয়া তুলিল। মহাভারতের যুগে শ্রীকৃষ্ণের হাতে 'সুদর্শন' আর নবীন ভারতে শ্রীঅরবিন্দের হতে 'বন্দে মাতরম্' একই কাজ করিয়াছে।"

ব্রিটিশ শাসক 'দ্য ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট, ১৮৭৮' ও 'দ্য ইন্ডিয়ান প্রেস অ্যাক্ট, ১৯১০'-এর মতো বিভিন্ন আইন প্রয়োগের মাধ্যমে জাতীয়তাবাদী পত্রপত্রিকাগুলির গণবণ্টন রোধে উদ্যোগী হয়।

প্রশাসনিক সংস্কারের প্রলোভন দেখিয়েও ব্রিটিশ শাসক দেশজুড়ে সংগঠিত অসন্তোষ ও বিদ্রোহ দমনে ব্যর্থ তখন। শ্রীঅরবিন্দ বললেন, 'সরকারের নির্যাতন ঈশ্বরের হাতুড়ি। নির্যাতনের ক্রমে চরিত্র গঠন অনিবার্য।' সুরাট অধিবেশনে কংগ্রেসের মধ্যে রাজনীতির দু'টি ধারা স্পষ্ট হয়। বিপ্লবী মতাদর্শের পথেই দেশের মুক্তিপথ খুঁজে পেলেন শ্রীঅরবিন্দ।

শ্রীঅরবিন্দের রাজনৈতিক চিন্তার মধ্যেই ছিল আধ্যাত্মিক সাধনার সমাহার। □

সেকুলারিজম : ইতিহাস ও ভারতীয় সভ্যতার সংঘাত

উত্তম মণ্ডল

'সেকুলারিজম' খুঁজতে ভারতের বাইরে আজ বরং চীনে যাওয়া যাক। ঠিকানা : চীনের জিনজিয়াং অঞ্চল। মুসলমানদের কাছে এটি পরিচিত 'ইস্ট তুর্কিস্তান' নামে। আর এখানে বসবাসকারী মুসলমান 'উইঘুর' নামে পরিচিত। অখণ্ড ভারতের মধ্যে থেকেও পাকিস্তান দাবির অনুকরণে সেখানকার মুসলমানরাও আলাদা দেশের দাবি তোলে। কিন্তু কমিউনিস্ট চীনে তো আর গান্ধী-নেহরুর মতো নেতার জন্ম হয়নি, তাই সেখানে 'সেকুলারিজম' বলে কোনো শব্দ তৈরিও হয়নি। ফলে চীন সরকার কঠোরহস্তে উইঘুরদের আলাদা দেশের দাবিকে দমন করে সবকিছু ঠাণ্ডা করে দেয়। অথচ 'সেকুলার' ভারতের ইতিহাসের পাতায় সুলতান মামুদ, বখতিয়ার খলজি, তৈমুরলং, নাদির শাহ, আহম্মদ শা আবদালিদের রক্তাক্ত ভারত অভিযানের ইতিহাসে এই আক্রমণকারীদের 'বীর নায়ক' বানিয়ে তাদের নাম এখনো গর্বের সঙ্গে উচ্চারিত হয়। ভারতের মাটিতে ঘটে যাওয়া বিগত দিনের এসব আক্রমণ প্রকৃতপক্ষে হলো— 'জেহাদ'। এত জেহাদের পরেও টিকে আছে ভারতবর্ষ। মিশর, ব্যাবিলন, আসিরিয়া বা মায়া সভ্যতার কথা আজ শুধুমাত্র ইতিহাসের পাতায় সীমাবদ্ধ একটি বিষয়। গ্রিক ও রোম সভ্যতার চিহ্নগুলি জাদুঘরের সৌন্দর্য বাড়াচ্ছে মাত্র, সেখানে ভারতীয় সভ্যতা এখনো এক অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ হিসেবে বহমান। এর মূলে রয়েছে ভারতের অভ্যন্তরীণ ঐক্য। বিভিন্ন বর্ণ ও সম্প্রদায় নিয়ে গড়ে ওঠা বিশাল জনসমষ্টির দেশ ভারতবর্ষ হচ্ছে ভারত সন্ততির দেশ।

খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে ভারতের প্রশাসনিক ভাষা ছিল 'প্রাকৃত'। অতি দূর প্রান্তের প্রজার কাছেও এই ভাষাতেই পৌঁছে যেত রাজার আদেশ। এর থেকেও বহু প্রাচীন হলো— সংস্কৃত ভাষা। পঞ্জাবের তক্ষশীলার পণ্ডিত সমাজে, নৈমিষারণ্যের সন্ন্যাসীদের মধ্যে, তামিল-কানাডা রাজ্যগুলিতেও একসঙ্গেই চর্চা হতো বেদ-রামায়ণ-মহাভারত- পুরাণের। শিব ও বিষ্ণু মন্দির যেমন রয়েছে উত্তরে হিমালয় অঞ্চলে, তেমনি রয়েছে দাক্ষিণাত্যে কৃষ্ণা-কাবেরীর তীরে-তীরে। এই চর্চা ও সাংস্কৃতিক বন্ধনে জড়িয়ে ছিল গোটা ভারতবর্ষ। এভাবেই গোটা ভারতবর্ষ সবসময় এক রাজশক্তির অধীনে না থাকলেও এক সাংস্কৃতিক বন্ধনে আবদ্ধ ছিল। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা এবং বঙ্গোপসাগর থেকে আরব সাগর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগে ভারতের মানুষকে এক বন্ধনহীন সাংস্কৃতিক গ্রন্থিতে জড়িয়েছিল। প্রাচীনকাল থেকে এই সাংস্কৃতিক জাতীয়তা বিশাল ঐক্যবদ্ধ ভারতবর্ষকে পরবর্তীকালে নেহরু নিয়োজিত কমিউনিস্ট ঐতিহাসিকরা তাকে উপেক্ষা করে হিন্দু জাতির মধ্যে কৃত্রিম অনৈক্যের কথাই প্রচার করেছেন। আর শাশ্বত ভারতের গৌরবময় সভ্যতাকে হেয় করে ইসলামি সংস্কৃতির দাবিকে প্রতিষ্ঠিত করতে সংবিধানের ৫১-এ সি এল (এফ) (51-A CL(F) ধারায় 'কম্পোজিট কালচার' অর্থাৎ 'মিশ্র সংস্কৃতি' ধারাটি সংযোজিত হয়েছে গান্ধী-নেহরু-কংগ্রেসের সৌজন্যে।

এর মধ্যেই চলে বিকৃত ইতিহাস লেখা। এ বিষয়ে ঐতিহাসিক ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন,— 'It is painful to mention, though impossible to ignore the fact that it is a distinct and conscious attempt to re-write the whole chapter of bigotry and intolerance of the Muslims rulers towards Hindu religion.' —The History and Culture of the Indian People (The Mughul Empire), Preface-XI.

অর্থাৎ মুসলমান শাসকদের হিন্দুদের প্রতি যে উগ্রতা ও অসহিষ্ণুতা ছিল, সেই পুরো অধ্যায়টিকেই সুস্পষ্ট ও সচেতনভাবে প্রলেপ করা হয়েছে।

১৯১৫ সালে অনুষ্ঠিত ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে ঐতিহাসিক স্যার যদুনাথ সরকার বলেছিলেন, —'I would not care whether truth is pleasant or unpleasant and in consonance with or opposed to current views...But I still shall seek truth, understand truth and accept truth. This should be the firm resolve of a historian.' অর্থাৎ 'সত্য তা সে মনোরম অথবা রূঢ়, প্রচলিত মতের বিরোধী অথবা সামঞ্জস্যপূর্ণ, যাই হোক না কেন, তা আমার বিচার্য নয়।... আমি সত্যান্বেষী, সত্য বুঝি এবং সত্যকে গ্রহণ করি। এটিই একজন ইতিহাসবিদের স্থির সংকল্প হওয়া উচিত।'

বলাবাহুল্য, এই নীতি অনুসৃত হয়নি স্বাধীন ভারতে ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে। ফিরে আসা যাক ফের চীনের কথায়, যা দিয়ে শুরু হয়েছিল এই লেখা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় চীন ও কোরিয়ার কিছু অঞ্চল দখল করেছিল জাপান। ওই সময় চীনা ও কোরিয়ান মেয়েদের 'কমফোর্ট গার্ল' হিসেবে জাপানি সৈন্যরা নিজেদের শিবিরে নিয়ে যেত। পরবর্তীকালে চীন ও কোরিয়া সরকারের তরফে এজন্য জাপানকে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে বলা হয় এবং অত্যাচারিত মেয়েদের ক্ষতিপূরণ দেবার দাবি জানানো হয়।

যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে জাপানের পক্ষ থেকে এই ঘটনার জন্য আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করাও হয়। এছাড়া আগামীদিনে ওই দুই দেশের সঙ্গে যাতে জাপানের তিক্ততা সৃষ্টি না হয়, সেজন্য জাপান তাদের ইতিহাসের পাতা থেকে বিষয়টি বাদ দেবার পরিকল্পনা করে। কিন্তু জাপানের এই ইতিহাস বাদ দেবার বিষয়ে তীব্র প্রতিবাদ জানায় চীন। যেখানে অন্য দেশের ইতিহাস সংশোধনের চেষ্টার বিরোধিতা করছে কমিউনিস্ট চীন, সেখানে ভারতে কমিউনিস্ট ইতিহাসবিদরা সেকুলারিজমের দোহাই দিয়ে বিকৃত করেছেন এ দেশের ইতিহাস। এই সাংস্কৃতিক অপরাধ এখন আমাদের সভ্যতার সর্বনাশা সংকট ডেকে এনেছে। ▯

দেড় দশকের ‘তৃণমূলি ত্রাস’ জনতার ‘তাৎক্ষণিক বিচার’!

বিপ্লব বিকাশ

গত ৩০ মে সোনারপুরে এবং ৩১ মে চণ্ডীতলায় যা ঘটল, তা কেবল দুটি বিচ্ছিন্ন বা আকস্মিক ঘটনা নয়; বরং তা হলো বিগত দেড় দশক ধরে তৃণমূলের গুন্ডাবাহিনী এবং তাদের শীর্ষ নেতাদের দ্বারা অত্যাচারিত সাধারণ মানুষের দীর্ঘশ্বাসের এক পুঞ্জীভূত ও স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশ। সোনারপুরের মাটিতে ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং চণ্ডীতলায় কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর যে গণরোষ আছড়ে পড়ল, তা প্রমাণ করে ভয় দেখিয়ে, পুলিশ প্রশাসনকে দলদাস করে এবং পেশিশক্তি প্রয়োগ করে মানুষকে চিরকাল স্তব্ধ করে রাখা যায় না।

বিগত ১৫ বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গের সনাতনী হিন্দু সমাজকে এক চরম শ্বাসরোধকারী পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। ভোট এলেই বুথ দখল, বিরোধী কণ্ঠস্বরকে নির্মমভাবে স্তব্ধ করা, পঞ্চায়েত থেকে লোকসভা— সর্বত্র সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে হরণ করার যে মডেল এই রাজ্যে কায়েম করা হয়েছিল, তার নেপথ্যে অন্যতম প্রধান কারিগর ছিলেন এই রাজ্যের তৎকালীন শাসকদলের যুবরাজ। ডায়মন্ড হারবার থেকে শুরু করে সোনারপুর, ভাঙড়, মিনাখাঁ বা এককথায় পুরো পশ্চিমবঙ্গে যে সিন্ডিকেটরাজ, তোলাবাজি ও ভোটাধিকার হরণের যে সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল, তার অদৃশ্য সুতোটি কার হাতে ছিল, তা রাজ্যের মানুষ খুব ভালো করেই জানেন।

একদা জেপি নাড্ডার কনভয়ে যখন হামলা হয়েছিল, তখন অহংকারের সুরে একে ‘জনগণের ক্ষোভ’ বলে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। এই নির্বাচনের প্রচার চলাকালীন আরামবাগের মাটিতে দাঁড়িয়ে হুঙ্কার দেওয়া হয়েছিল— ‘৪ তারিখ দুপুর ১২টার পর দিল্লির কোনো বাপ কাকে বাঁচাতে আসে দেখে নেব’। ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস, আজ সেই দম্ভ আর হুমকির ভাষা সাধারণ মানুষের জুতো, পাথর আর পচা ডিমের আঘাতে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। সোনারপুরের মা-বোনেরা যখন মাথায় হেলমেট পরা যুবরাজকে ঘিরে ধরে ‘চোর চোর’ স্লোগান দেন, তখন বুঝতে হবে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া মানুষের ভয়টা এবার কেটে গেছে। ১৫ বছর ধরে যে ক্ষোভের আগুনকে পঞ্চায়েত ভোটে বোমা মেরে, রক্ত ঝরিয়ে ধামাচাপা দেওয়া হয়েছিল, সেই আগুনই আজ পথে-ঘাটে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে। সোশ্যাল মিডিয়াতে মানুষ বলছে ভালোই ডিজে বাজলো। ডি মানে ডিম আর জে মানে জুতো। খেলা হবে ডিজেতে যারা নেচেছিলেন তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন তৎকাল বিজেপি হয়ে ‘মাছ চোর’ এবং ‘ফাইল চোর’ গানেও বেশ জমজমাটে নাচ দেখাচ্ছেন। আজ অনেকেই এই ডিম-জুতোর ডিজে পার্টির কর্মকর্তা বা ব্যবস্থাপক। পুরোনো গোষ্ঠীর ক্ষোভ বা নতুন করে নিজেকে বড়ো বিজেপি প্রমাণিত করার প্রতিযোগিতা— কোনটা ঠিক সেটা সময় বলবে। কিন্তু এইসব সম্ভাবনা রয়েছে বলে মনে হয়।

কিন্তু হ্যাঁ, সাধারণ মানুষের এই লড়াই কেবল রাজনৈতিক ক্ষমতার পরিবর্তনের নয়, এই লড়াই হিন্দুদের আত্মপরিচয়ের ও আত্মমর্যাদার লড়াই। যে চণ্ডীতলায় কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় আক্রান্ত হলেন, সেই চণ্ডীতলা বা হুগলীর বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বছরের পর বছর ধরে তোষণের রাজনীতি চালিয়ে যাওয়া হয়েছে। হিন্দুদের উৎসব-অনুষ্ঠানে বাধা সৃষ্টি করা থেকে শুরু করে রামনবমীর শোভাযাত্রায় আক্রমণ— সবকিছুতেই এক অদ্ভুত নীরবতা বা প্রচ্ছন্ন মদত দেখা গেছে তৎকালীন শাসকদলের পক্ষ থেকে। মানুষ যখন নিজের ঘরে সুরক্ষিত বোধ করে না, নিজের ভোটটা নিজে দিতে পারে না, তখন এক চরম ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। হুগলীতে কেন্দ্রীয় বাহিনী ছাড়া পা রাখার দম্ভ প্রকাশ করেছিলেন যে নেতারা, আজ চণ্ডীতলা থানার সামনে দাঁড়িয়ে তারাই মাথায় আঘাত না পেয়েও মাটিতে লুটিয়ে পড়ছেন। এটি কোনো কাপুরুষোচিত হামলা নয়, এটি হলো বছরের পর বছর ধরে রাজ্য পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা এবং শাসকের গুন্ডামির বিরুদ্ধে জনতার রোষ।

পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে দাঁড়িয়ে তখন যারা নিজেদের অপ্রতিরোধ্য ভাবছিলেন, অজেয় মনে করছিলেন, সোনারপুর ও চণ্ডীতলা তাদের জন্য এক চরম সতর্কবার্তা। রোম যখন পুড়ছিল, নিরো তখন বাঁশি বাজাচ্ছিলেন আর পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল গুন্ডাবাহিনী যখন সাধারণ মানুষের ওপর অত্যাচার করছিল, মায়েদের বস্ত্র হরণ করে প্যারেড করাচ্ছিল তখন তাদের সর্দাররা ক্ষমতার অলিন্দে বসে অট্টহাসি হাসছিলেন, রগড়ানি দিবস পালন করছিলেন। কিন্তু হিন্দু সমাজ ও রাজ্যের জাগ্রত জনতা আজ ভয়মুক্ত। চণ্ডীতলার ঘটনা বা সোনারপুরে উড়ে আসা ডিম ও জুতো আসলে প্রমাণ করে— এই রাজ্যে স্বৈরাচারী ও তোষণকারী রাজনীতির প্রতি মানুষের ঘৃণা। সাধারণ মানুষের এই স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধই পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে প্রকৃত গণতন্ত্র এবং হারিয়ে যাওয়া গৌরব ফিরিয়ে এনেছে।

চণ্ডীতলার ঘটনা বা সোনারপুরে উড়ে আসা ডিম ও জুতো আসলে প্রমাণ করে— এই রাজ্যে স্বৈরাচারী ও তোষণকারী রাজনীতির প্রতি মানুষের ঘৃণা। সাধারণ মানুষের এই স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধই পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে প্রকৃত গণতন্ত্র এবং হারিয়ে যাওয়া গৌরব ফিরিয়ে এনেছে।

গল্পকথায় ডাক্তারজী

(৮২)

সহজ কথা কঠিন সত্য

'হিন্দু যুবক পরিষদের' সভাপতি রূপে সভায় ডাক্তারজী ভাষণ দিলেন। প্রথম কথায় তিনি জানালেন— 'স্টেশনে পা রাখতেই এখানকার মানুষেরা যে বিরাট স্বাগত ও সংবর্ধনা শুরু করেন, তাতে আমি খানিকটা অস্বস্তি বোধ করছি'। রাষ্ট্রবোধের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর বক্তব্য ছিল— 'আমি সমাজের জন্য' এই মনোভাব বিস্মৃত হয়ে 'সমাজ আমার জন্য' আমরা এই মনোভাবের শিকার হয়ে পড়েছি। আজ তরুণ সমাজের মধ্যে এমন ভাবনার জাগরণ ঘটছে যে সমাজ বাঁচলে আমরা বাঁচবো। তিনিই প্রকৃত রাষ্ট্র সেবক যিনি ভাবতে পারেন 'আমি ও রাষ্ট্র এক' এবং এই ভাবনা নিয়ে রাষ্ট্র তথা সমাজের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যান। অনেকে গর্ব করে বলে 'আমি রাষ্ট্রের জন্য ত্যাগ করেছি' তখন তার অর্থ এরকম দাঁড়ায়নাকি যে সে আর রাষ্ট্র আলাদা। 'আমি আমার ছেলের জন্য এত ত্যাগ করেছি'। এ কথা বলা যেমন বাতুলতা অপরপক্ষে ভাবা উচিত রাষ্ট্রের জন্য ত্যাগ করা, কষ্ট সহ্য করা আমার কোনো অবদান, উপকার নয় এ আমার পবিত্র কর্তব্য।

একবার সাঁতারা জেলার ঔন্ধের রাজা বালাসাহেব পন্তের আমন্ত্রণে ডাক্তারজী সেখানে গিয়েছিলেন। ডাক্তারজীর অবশ্য সেখানে যাওয়ার বড়ো উদ্দেশ্য ছিল ঔন্ধ নরেশের আগ্রহানুসারে সঙ্ঘ শাখা শুরু করা। এর মাঝেই একদিন রাজপ্রাসাদ সংলগ্ন মন্দিরে দর্শন হেতু মহারাজ এবং ডাক্তারজী দু'জনেই গেলেন। মন্দিরের যা কিছু শিল্পকলা স্থাপত্য সবকিছু মহারাজের কল্পনা ও শিল্পীসত্তার প্রতিফলন ছিল। দেবী দর্শনের পরে মন্দির গাত্রে সমস্ত ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক চিত্রের নানা রেখাঙ্কন দেখে ডাক্তারজী প্রশংসা করছিলেন। ঘুরতে ঘুরতে একটা ছবির কাছে এসে ডাক্তারজী দাঁড়িয়ে পড়লেন। ছবিতে মাতা জিজাবাঈয়ের ছবি এমনভাবে চিত্রায়িত করা হয়েছিল যেখানে দেখা যাচ্ছিল স্বয়ং শিব অবতার রূপে মাতা জিজাবাঈয়ের গর্ভে জন্ম নিতে চলেছেন। এবার ডাক্তারজী মহারাজের দিকে তাকিয়ে বললেন— 'মহারাজ, এই অবতারের কল্পনা আমাদের সমাজের সর্বনাশ করেছে। নিজের অসামান্য প্রয়াস তথা অতুল পরাক্রম দ্বারা সমাজে যিনি নব চৈতন্য সৃষ্টি করেছিলেন, সেই ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের ওপর এই দেবত্বের শীলমোহর কেন লাগাচ্ছেন?'

মহারাজ ডাক্তারজীর এই দৃষ্টিভঙ্গির কথা শুনে বিস্মিত হলেন এবং তাঁর কথার পরিপূর্ণ স্বীকৃতি জানালেন। গভীর সত্যকে সহজভাবে সকলের কাছে তুলে ধরা ডাক্তারজীর ছিল এক অনুপম বৈশিষ্ট্য।

(৮৩)

সংগঠন শক্তির উৎস মর্যাদা পালন

দেশব্যাপী সংগঠন গড়ে তোলার সংকল্প গ্রহণ করে ডাক্তারজী অক্লান্ত পরিশ্রম করছিলেন। কিন্তু সে সময় পরাধীন দেশের সমাজ আর্থিক মানসিক দিক থেকে ছিল খুবই দুর্বল। এমন সমাজকে যথেষ্ট শক্তিশালী করে গড়ে তোলার জন্য যে সমস্ত কর্মযজ্ঞ, কার্যধারার প্রবাহ নিরবচ্ছিন্ন রাখার প্রয়োজন তাতে অনেক অর্থের প্রয়োজন। নেতৃত্বের হাতে প্রচুর খরচ করার মতো অর্থ সামর্থ্য থাকা প্রয়োজন। কিন্তু ডাক্তারজীরতো নিজের দিন চলাই ছিল দুষ্কর। হাত খুলে সংগঠনের জন্য পয়সা খরচ করার সামর্থ্য তাঁর ছিল না। এমন পরিস্থিতিতে সঙ্ঘের হিতাকাঙ্ক্ষী কয়েকজন সজ্জন ব্যক্তি অত্যন্ত চিন্তিত ছিলেন। মনে মনে সকলে কষ্টও অনুভব করতেন। এক সময় তাদের মনে চিন্তা এল-লটারি করে কিছু অর্থ উপার্জন করা যেতে পারে। এই ভাবনায় ডাক্তারজীর নিকট লটারির পত্রকে স্বাক্ষর করার জন্য চিঠি এলে তিনি উত্তরে লিখলেন— 'পূজ্য বাবারাও (সাভারকর)-এর পত্র পেয়েছি। তাকে জানিয়ে দেবেন পূর্ণ বিবেচনা করার পর আমার অভিমত আগের মতোই স্থির আছে। লটারির পত্রকে আমি স্বাক্ষর করতে পারছি না।' ডাক্তারজীর মনে ছিল উদ্যমহীন দুর্বল সমাজ যদি লটারি জুয়ার মাধ্যমে অর্থ উপার্জনের পথ খুঁজে পায়, অভ্যস্ত হয়ে পড়ে তবে তার মধ্যে আত্মবিশ্বাস পুরুষার্থের ভাব সম্পূর্ণ লোপ পাবে। এর ফলে সমাজ আরও বেশি দুর্বল, পঙ্গু, পরাবলম্বী হয়ে পড়বে। লটারির টাকা পেলে যাদের জন্য সংগঠন তৈরি করা তারাই দুর্বল হয়ে পড়বে। মানুষের মধ্যে দেশ ভক্তি ও সমাজের প্রতি ভালোবাসার কারণে যে অর্থ পাওয়া যাবে সমাজ সংগঠনের পক্ষে তাই হবে অধিক লাভজনক। সততা, পরিশ্রম, নিষ্ঠা, শুদ্ধতার মধ্য দিয়ে শুধু একজন ব্যক্তি নয়, সংগঠনও গড়ে ওঠে।

একবার মহারাষ্ট্রের বিশিষ্ট ব্যক্তি আচার্য শ্রীরাম গোঁসাবী ডাক্তারজীকে পত্রের মাধ্যমে প্রস্তাব দেন যে তিনি ডাক্তারজীর ভাষণগুলির একটি সংকলন সঙ্ঘের নামে প্রকাশ করতে চান এবং ডাক্তারজীকে অনুরোধ করেন প্রস্তাবনা লিখে দেওয়ার জন্য। ডাক্তারজী উত্তরে জানিয়েছিলেন— 'আজ পর্যন্ত অনুসৃত নীতি অনুসারে আপনার পুস্তকে সঙ্ঘের নাম করা সম্ভব নয়। এইভাবে আজ পর্যন্ত আমি যে নীতি অনুসরণ করে চলেছি। তদনুযায়ী আপনার পুস্তকে প্রস্তাবনা লেখার কাজও আমি স্বীকার করতে পারছি না।" ডাক্তারজীর লক্ষ্য ছিল প্রত্যক্ষ জীবন ও চরিত্রের ছাপ, ব্যবহার, ব্যক্তিত্ব এসবের প্রভাব তরুণ মনে যে প্রেরণা সৃষ্টি করবে, তাদের চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করবে, তার দ্বারাই সংগঠন কার্যসম্পন্ন ও শক্তিশালী হবে। অনুকূল প্রতিকূল সব অবস্থার মধ্যেই ব্যক্তি এবং সংগঠনকে রক্ষা করা, গড়ে তোলার মূল মন্ত্র— 'মর্যাদা রক্ষা', ডাক্তারজীর কর্মজীবনের সবচাইতে বড়ো উদাহরণ।

সংকলক—বিমলকৃষ্ণ দাস